রূপসী চাঁদপুর

(নিয়মিত ত্রৈমাসিক ইন্টারনেট সাহিত্য পত্রিকা)
প্রকাশকাল: *আগষ্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর '০৫*
৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

নজরুল সংখ্যা ২০০৫ইং

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
শফিকুল আলম ফিরোজ

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
দেওয়ান আবদুল বাসেত

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
লুবনা বাসেত বৃষ্টি

চাঁদপুর, বাংলাদেশে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি
আসিফ ইসলাম

এ সংখ্যার লেখক – প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মনোহর আলী, ডাঃ মোঃ আহ্সান উল্লাহ্, মাহমুদুল হাসান বাতেন, পীযুষ কান্তিরায় চৌধুরী, রুপালী চম্পক, রানা জামান, দুলাল চন্দ্র দাস, মৃদুল রায় টিটু, মিজানুর রহমান রানা, মাহবুব আনোয়ার বাবলু

কবিতা

এইচ. এম. আজাদ, প্রবীর মজুমদার বাবুল, জাবেদ ইমন, এস.এম. জয়নাল আবেদীন।

প্রকাশক ঃ মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স এর একটি প্রকাশনা, বাংলাদেশ।

Marupalash Group of Publications
E-mail: marupalash@yahoo.com

http://www.marupalash.com

সম্পাদকীয়

সম্পাদকীয়

রূপসী চাঁদপুর এর বর্তমান সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে শুধুমাত্র চাঁদপুরের লেখকদের লেখা নিয়ে। তাঁরা বিভিন্নভাবে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করেছেন। দেখেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে । তথ্যবহুল লেখাও কেউ কেউ লিখেছেন। কবির প্রতি তাঁদের ভালোবাসায় সিক্ত লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে এবারের ***রূপসী চাঁদপুর*** সাহিত্যপত্র। এই অতি মূল্যবান লেখাগুলো সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন ***রূপসী চাঁদপুর*** এর চাঁদপুর জেলা প্রতিনিধি। তিনি ***মরুপলাশ*** এরও বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি, সৃজনশীল মানসিকতার এক টগবগে তরুণ যুবক ***আসিফ ইসলাম*** । তাকে আমাদের পত্রিকাদ্বয়ের পক্ষ থেকে শরৎ শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রূপসী চাঁদপুর এর বর্তমান সংখ্যাটি ***নজরুল সংখ্যা*** শিরোনামে প্রকাশিত হলো। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী শিরোনামে একটি বিশেষ আইকন প্রকাশ করার উদ্যোগে আমরা বিভিন্ন ওয়েবম্যাগাজিনে লেখা আহ্বান করেছিলাম। লেখক এবং পাঠকদের এমন ব্যাপক সাড়া আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে, সাহসী করেছে। উল্লেখ্য আসিফ ইসলাম প্রেরিত আরও কিছু লেখা আমরা ***রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী*** আইকনে সংকলিত করেছি। লেখকদের আন্তরিক অনুরোধ করবো, সে আইকনে একটু নজর দেবার জন্যে। আপনাদের মধ্য থেকেই কেহ একজন চাঁদপুরের ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে লিখুন। কেন না আমাদের চাঁদপুরের লেখকদেরই প্রধান দায়িত্ব পুরো বিশ্বে চাঁদপুর এর মুক্তিযুদ্ধ পুর্ব এবং মুক্তিযুদ্ধ উত্তর সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা। ছড়িয়ে দেয়া পুরোবিশ্বে চাঁদপুরের অজানা সব রূপ-রস-গন্ধ ।

রূপসী চাঁদপুর এর পক্ষ থেকে সকল লেখকদের জন্য থাকলো অন্তবিহীন শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।
সবার প্রবাস জীবন হোক শান্তিময় এবং ভরে উঠুক সফলতার সোনাদানায়।

রূপসী চাঁদপুর জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিকথা

সুচনাঃ বৃটিশ শাসনামলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস্ রেনেলের সময়ে চাঁদপুর একটি অখ্যাত জনপদ ছিলো। সে সময়ে চাঁদপুরের দক্ষিণে অবস্থিত নরসিংহপুর ছিলো একটি উলেখযোগ্য জনপদ যেখানে উপজেলা সদর ও অন্যান্য অফিস-আদালত স্থাপিত হয়। পদ্মা মেঘনা নদীর গর্ভে নরসিংহপুর বিলীন হওয়াতে চাঁদপুরের পত্তন হয়। ১৭৭৮ সালে চাঁদপুর মহকুমা এবং ১৯৮৪ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারী জেলায় রূপান্তরিত হয়।

সীমাঃ চাঁদপুর জেলার উত্তর ও উত্তর পূর্বে কুমিলা, উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে মুন্সিগঞ্জ, পশ্চিমে শরিয়তপুর, দক্ষিণ পশ্চিমে বরিশাল এবং দক্ষিণে লক্ষ্মীপুর জেলা অবস্থিত।

আয়তনঃ আয়তনের ভিত্তিতে চাঁদপুর বাংলাদেশের ৩৯ তম জেলা এবং এর আয়তন ১,৭০৪ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর দক্ষিণে এই জেলায় প্রায় ৪৫ কিলোমিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে ৩১ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

জনসংখ্যাঃ জনসংখ্যার ভিত্তিতে চাঁদপুর বাংলাদেশের ১৮ তম জেলা এবং এর জনসংখ্যা প্রায় ২,১৪৮,৯৭২। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা প্রায় ১,০৭৩,৯৯২ জন এবং মহিলা সংখ্যা ১,০৭৪,৯৮০জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে প্রায় ১,২৬১জন। পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ১০০ঃ১০০। পরিবারের গড় আকার ৫.৮২ এবং পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৩৬৯,২৩৯।

কৃষিঃ এই জেলায় প্রায় ১১৭, ৯৮৬ হেক্টর আবাদযোগ্য জমি রয়েছে। এখানে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, গম, পাট, সরিষা, তিল, তিসি, ভুট্টা, ডাল, আলু, মিষ্টি আলু, শাক-শবজি ফল প্রভৃতি উলেখযোগ্য। উলেখ্য চাঁদপুরের চকচকে রুপোলী ইলিশ এবং ইক্ষু দেশের কোনে কোনে এর খ্যাতি খুশবু দানার মতো ছড়িয়ে দিয়েছে।

শিল্পঃ চাঁদপুর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী বন্দর। এখানে গড়ে ওঠা শিল্পের মধ্যে পাট, ঔষধ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরী, মৎস পক্রিয়াজাত প্রভৃতি উলেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ চাঁদপুর জেলায় প্রায় ২৪২ কিলোমিটার সড়ক পথ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ১৭৪ কিলোমিটার পাকা। সড়ক পথে জেলার সবগুলো উপজেলায় যাতায়াত করা যায়। রেল ও নদী পথে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে।

স্বাস্থ্যঃ স্বাস্থ্য সেবার জন্য এই জেলায় ৫০টি শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল, ৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স, ২০টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, ১টি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, একটি চক্ষু হাসপাতাল, ১টি কলেরা হাসপাতাল, ৩টি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, ৭টি পরিবার কল্যান কেন্দ্র, ১টি বেসরকারী হাসপাতাল, ৭টি পশু চিকিৎসালয়, ৭টি প্রজনন উপকেন্দ্র এবং ১১টি প্রজনন পয়েন্ট রয়েছে।

শিক্ষাঃ চাঁদপুরে শিক্ষার হার প্রায় শতকরা ৩৭.৮ ভাগ। তন্মধ্যে পুরুষের শিক্ষার হার শতকরা ৪২.৭ ভাগ এবং মহিলা শিক্ষার হার শতকরা ৩৩.০ভাগ। শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে এ জেলায় ৮০৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৩৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৯টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪০টি মাদ্রাসা, ৭টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২১৮টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি সরকারী কলেজ (পুরুষ) ১টি সরকারী মহিলা কলেজ এবং ২২টি বেসরকারী কলেজ রয়েছে।

অন্যান্যঃ (ক) উপজেলাঃ ৭টি । কচুয়া, চাঁদপুর সদর, ফরিদগঞ্জ, মতলব, শাহরাস্তি, হাইমচর এবং হাজিগঞ্জ।
(খ) ইউনিয়নঃ ৮৯।
(গ) মৌজাঃ ১,০৪৮টি।
(ঘ) পৌরসভাঃ ৫টি। কচুয়া, চাঁদপুর, ছেঙ্গারচর, মতলব ও হাজিগঞ্জ।
(ঙ) সংসদের আসন ঃ ৬টি।
(চ) নদ-নদী ঃ ২টি । ডাকাতিয়া ও মেঘনা।
(msKwjZ)

আধুনিক বাংলা কাব্যে বিপ্লব ও প্রেম অনুভবে অপুনর্ভব নজরুল

প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন

এই জনমে বহুদিন আগে আমি যখন খুবই ছোট, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর পড়ুয়া তখন আমার প্রয়াত মা তার সন্তানকে খুবই যত্ন করে কবিতা শেখাতেন-

''আমি হবো সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি ডাকি।
সুর্যি মামা উঠার আগে উঠব আমি জেগে
'হয়নি সকাল ঘুমো এখন' মা বলবেন রেগে"

মায়ের মুখ থেকে শুনে শুনে কবিতা কণ্ঠস্থ করতাম আমি। কবির নাম জানার প্রয়োজন তখনও অনুভূত হয়নি। তারপর যখন সিঁড়ি টপকে টপকে শ্রেণী কক্ষের পরিবর্তন হলো, তখন শ্রেণী শিক্ষক আব্দুল হাই মাষ্টার কবির সঙ্গে কবিতা রচয়িতার নাম মনে রাখতে শেখালেন। জানলাম আমার প্রিয় কবিতাটির রচয়িতার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। সেই থেকে তিনি আমার প্রিয় কবি। মুখস্ত করলাম আরো একটি কবিতা যেখানে তিনি একটি শিশুর কর্তব্য কর্মকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুল করেননি। তিনি কবিতার মাধ্যমে ছোট শিশুদের আহবান করেছেন মহৎ কর্মে, জ্ঞানের পথে। তাইতো তিনি ছোটদের ডাক দিয়ে প্রভাতী কবিতায় বলেছেন-

'ভোর হলো
দোর খোলো
খুকুমনি উঠরে,
ওই ডাকে
জুঁই শাখে
ফুল-খুকী ছোটরে।
খুকুমনি ওঠরে।'

কবির আহ্বানে খুকু ঘুম থেকে জেগে উঠলে, তার প্রভাতিক কর্তব্য কি হবে তা তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন কবিতার মাধ্যমে। কবিতাটির গতি অবারিত এবং প্রভাতের বর্ণনাও মনোমুগ্ধকর। আমি আস্তে আস্তে তার কবিতার অনুরক্ত পাঠকে পরিণত হয়ে যাই। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যেতে শুরু করে। শিশুকাল শেষ করে আমি এখন উচ্চ বিদ্যালয়ে এসেছি কবিতার সঙ্গে কবির পরিচয় জানা আমার জন্যে বাংলা শিক্ষক ওয়াহিদুল আলম নির্ধারিন করে দিলেন। আমি ব্যাপারটিকে গ্রহণ করলাম শিরোধার্যরূপে। কবি নজরুল ইসলাম পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে ইংরেজি ১৮৯৯ সালে অর্থাৎ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ফকির আহমদ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন। ৮ বছর বয়সে তিনি তার পিতাকে হারান। পিতৃহারা সংসারে চলছিল তখন দারুন অনটন। নিদারুন দারিদ্রের মাঝে বেড়ে উঠতে শুরু করেন বাংলার আগামী দিনের চারণ কবি। প্রেম ও বিপ্লবের ঈসা মসিহ। পরবর্তী কালে তিনি লিখেছেন- ' হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান, তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান।' আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্যে নজরুলের পাঠ্য জীবনে ব্যাঘাত ঘটে। গ্রামের মকতব থেকে তিনি নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখন ১৯১৪, যে সালে শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধ। উচ্চ বিদ্যালয়ে কবির তিন বছর শিক্ষা জীবন অতিক্রান্ত হয়েছে মাত্র। ১৯১৭ সালে কবি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। পড়াশুনা ত্যাগ করে ১৯ বছর বয়সে সৈনিক হিসেবে বাঙালি পল্টনে নাম লেখান তিনি। নিজ জন্মস্থান বাংলা থেকে বহু দুরে করাচিতে তার সৈনিক জীবন শুরু হয়। এগার/বার বছর বয়সে নজরুলের যে কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ শুরু হয়েছিলো, যুদ্ধে যোগ দিয়ে তাতে তিনি নতুন মাত্রা যোগ করেন। যুদ্ধে যোগদান করলেও তার কাব্য চর্চার বিরতি ছিল না। করাচিতে সে সময়ে তার সাথী যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই ফাসী সাহিত্যের সাথে পরিচিত ছিলেন। সাথীদের মাধ্যমে ফার্সী সাহিত্যের সাথে তারও সম্যক পরিচয় ঘটে। পারশ্য দেশের কালজয়ী কবি হাফিজ, রুমি, খৈয়াম ও ফেরদৌসির মহান সাহিত্য কর্মের সাথে তার জানা শোনা হয়। সেনা ছাউনিতে বসেই তিনি ফাসী সাহিত্য ভান্ডারের অমূল্য রত্নরাজি সংগ্রহ করেন।

পিতা কাজী ফকির আহমেদের মৃত্যুর পর জীবিকার সন্ধানে কাজী নজরুল ইসলামকে কিশোর বয়সেই গ্রামের লেটো দলের জন্যে গান আর পালা লিখতে হয়েছিলো। সে সময়ে তার লেখা গান অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নজরুলের গান লেখার হাতে খড়ি তখন থেকেই। এরপর অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। নজরুল সেনা দলে যোগ দিয়ে সেখানে অবস্থান কালীন সময়ে নিজেকে পরবর্তী কবি জীবনের জন্যে শানিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যাকাশের মধ্যমনি। বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র যুগে ধূমকেতু হিসেবে নজরুলের আর্বিভাব। বাংলা সাহিত্য ও সমাজ জীবনকে তার আর্বিভাব করেছে বৈচিত্র্যময় ও আলোকিত। ঘুনেধরা সমাজকে নাড়া দিয়েছেন তিনি। অজস্র লেখার মাধ্যমে গণ মানুষের ঘুম ভাঙ্গিয়েছেন তিনি।

''জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হত।
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত জন-মন মথিত বাণী
নব-জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত ॥

নজরুলের কবিতাই সর্বপ্রথম উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামী ঘোষণা। শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে শোষিত নির্যাতিত সর্বহারা শ্রেণী সংগ্রামে আহবান ধ্বনিত হয়েছিল। নজরুল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, সংগ্রাম ছাড়া অধিকার আদায়ের আর কোন সহজ সরল প্রথম নেই; তাই নিপীড়িত শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। নারী ও পুরুষের এবং সমাজের সকল মানুষের সমঅধিকারের প্রবক্তা ছিলেন নজরুল। এই সাম্যবাদী চেতনার অত্যন্ত বলিষ্ট প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের অনেক কবিতায়। এই প্রসংগে তার সাম্যবাদী কবিতা গুচ্ছের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে কবিকে মানবতার পূজারিরূপে দেখতে পাওয়া যায়। কবির কাছে মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, তার সৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান।

''গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।" (মানুষ)

মানবিকতার এমনি বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়েই নজরুল হাতে কলম নিয়েছিলেন। তাই তার কবিতায় শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ক্ষুধা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দৃপ্ত ঘোষণা উচ্চারিত হয়। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল নজরুল লেখা শুরু করেছিলেন কবিতা নয়, গল্প রচনার মধ্য দিয়েই। উপন্যাসও রচনা করেছেন তিনি। কিন্তু গল্প ও উপন্যাসের উপর নজরুলের সাহিত্যিক খ্যাতি তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। তার প্রথম কবিতা আত্মপ্রকাশ করে ১৯১৮ সালে, - 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়' - নাম মুক্তি। ১৯১৯ সালে কবি করাচি থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাঙ্গালি পল্টন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সৈনিক নজরুল রূপান্তরিত হলেন কবি নজরুলে।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের সক্রিয় সাহিত্য জীবনের ব্যাপ্তি খুব বেশী দিনের নয়। সম্ভবত এর পরিধি বিশ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি জীবনের জন্যে এ সময়কে যথেষ্ট বলা যায় না। তবুও এই বিশ বছরে সাহিত্যের প্রায় সকল অঙ্গানে নজরুল ইসলাম প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার সবল দৃপ্ত পদচারণা স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল। অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙালি মুসলিম সমাজে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। রবীন্দ্র ও মাইকেল মধুসূদনের মতো প্রাচুর্য্যের মধ্যে তিনি বেড়ে ওঠেননি, তাই তার সাহিত্য যতটা কর্ম কল্পনা বিলাসী নয় ঠিক ততটাই বাস্তব। বাস্তবতার নীরিখে রচিত বলে নজরুল কাব্য গণকাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের বহুমুখী প্রতিভার স্বার্থক রূপায়ন আমরা দেখতে পাই তার কবিতা, গান আর কথা সাহিত্যে। গানে তার প্রতিভার বিকাশ নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। তিনি বাংলা গানের সর্বশ্রেষ্ঠ গীতিকার। নিজে গান লিখেছেন, সুর করেছেন, গেয়েছেন এবং অন্যদের শিখিয়েছেন। কবিতার চেয়েও গানে আমরা তার প্রতিভার বিকাশ বেশী উজ্জ্বল দেখতে পাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম গীতিকার হিসেবে অবলীলায় নিজেকে চিহ্নিত করেছেন নজরুল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, গানের ক্ষেত্রে তিনি শ্রেষ্ঠতম। নিত্যান্ত কিশোর বয়সে তার কবি প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছে, সাহিত্যের দুনিয়া ছেড়ে তিনি বিদায় নিয়েছেন মাত্র ৪৩ বছর বয়সে। তখন তিনি যৌবনের মধ্য গগণে উপনীত হয়েছিলেন। তাই যৌবনের কবি হিসেবে তার পরিচয় সর্বব্যাপি। তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী আর ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী ও প্রচ রকমের সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের প্রতি বিশেষ করে কবিতার প্রতি তিনি ছিলেন একান্ত নিবেদিত।

যৌবনের সে সূচনা লগ্ন থেকে গানের নীলিমায় তিনি ছিলেন ভাস্বর। স্বল্প পরিসর সাহিত্যিক জীবনে তিনি কবিতা, ছড়া, নাটক, গান, গল্প ইত্যাদি মিলিয়ে যে বিপুল সৃষ্টি সম্ভার উপহার দিয়েছেন তার পরিমাণ প্রচুর। প্রথম যৌবনে সমাজের বন্ধ দুয়ারে করাঘাত করেছেন তিনি, পরিণত বয়সে প্রেমকে কবিতার শরীরে লালন করেছেন। প্রেমের বর্ণনা, উপমা ও রূপক তার লেখনিতে প্রাণের ছোঁয়া পেয়েছে। তার কবিতায় নারী পেয়েছে প্রেমিকার আসন, পেয়েছে সম্মান, হয়েছে প্রেয়সী। ভালবাসার পাত্রী হিসেবে নারীকে কখনো তিনি দেখেছেন কন্যা, জায়া, জননী রূপে। দারিদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও মন্বন্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রতিবাদ বার বার ঘুরে এসেছে তার কবিতায়। নজরুলের কবিতা বুঝতে হলে তার আর্বিভাবের কাল এবং সেই কালের বিশেষ রূপ ও লক্ষণ গুলো জানা দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনায় অর্থাৎ ১৯১৪-১৯১৮ সালের দিকে মানবতার বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের যুগে নজরুলের কাব্য চর্চার সুত্রপাত। ১৯১৯ সালে সৈনিক জীবন থেকে ফিরে নজরুল যে কবিতার জন্যে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তার নাম ‘বিদ্রোহী’- ১৯২০ সালে ‘মোসলেম ভারত’ নামক পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর থেকে অজস্র রচনায় কবি বাঙালী পাঠককে একেবারে বিস্ময়াভিভূত করে তুলেছেন, দেশের তরুণ চিত্তে তিনি লাভ করেছেন চিরকালের জন্য মহানায়কের প্রতিষ্ঠা। নজরুল কাব্যে বিদ্রোহ আর নারী সমভাবে এসেছে। নারী সমাজ দৈহিকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে শিকার সংগ্রহ ও যুদ্ধের মাঠে অনেকটা অসমর্থ, সেই কারণে তারা অবহেলার শিকার।

হিন্দুধর্মে জাতিভেদ থাকায় শূদ্র নারীর অবস্থা ছিল আরো করুন। অথচ শূদ্র সন্তান একলব্যই অযোধ্যা কুলবধূ, পঞ্চভার্যা দ্রৌপদীকে পরিচয় করায় তার শ্বাশত নারীরূপের সঙ্গে। কিন্তু বাস্তবে ক্ষমতাহীন মানুষই শূদ্র সন্তান মাত্র, আর পুরনারী সব যুগেই ভোগ্যা, দাসত্ব ও ধর্মের শেকলে বাঁধা। বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের গল্প গাঁথা। উপজীব্য হয়ে ওঠে প্রাচ্য পুরাণে। উদ nৃত্যে দেবরাজকে সন্তুষ্ট করে স্বামী লক্ষ্মীন্দরকে মৃত্যুপুরী থেকে ফিরিয়ে আনে সতী বেহুলা। প্রাচ্য দেশের নারীর অবস্থা এমনই। নারী ভোগের পণ্য মাত্র, কি পৌরাণিক, কি আজকের আধুনিকতায়-নারী সত্তার চিরাচরিত এই দ্বান্দ্বিক রূপই সকল সাহিত্যের উপজীব্য। নজরুল এই অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন। প্রণিধান যোগ্য তার ‘‘নারী”, ‘‘বারঙ্গনা”, ‘‘দোলন চাঁপা”, ‘‘নূরজাহান” কবিতাগুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথের ‘বলকা’র যুগে ‘বিদ্রোহীর কবি ও কবি-বিদ্রোহী নজরুলের আবির্ভাব একথা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। কবি গুরু যখন অমর যৌবনের জয়সংগীত উচ্চারণ করেছিলেন, যখন তিনি চিরকালের সবুজকে, অবুঝ ও আধমরাদের ঘা দিয়ে বাঁচাবার জন্যে, ক্ষমতাহীন দেবীর পূজাবেদীকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার জন্য দেশের গণমানুষকে আহবান জানাচ্ছিলেন, তখনই নজরুল প্রতিভার উন্মেষ। নজরুলের আগমনকে কবি গুরু হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, নজরুলের কবি জীবনের সুত্রপাত প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে। তার বয়স তখন ২০ অথবা ২১ ঐ বয়স থেকেই তার কবিতায় পরিণতির আভাস পাওয়া যায়। সে সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যুবক কবির বিশ্ববোধ। বিশ্বকবির চির সবুজদের গান এক প্রবল উন্মাদনা- উদ্দীপনায় বাংলার তরুণ প্রাণকে সঞ্জীবিত করেছিল। সে উদাত্ত সংগীত সেদিনের একুশ বছরের তরুণ নজরুলের অন্তর চিত্তকে উন্মুখ করে তুলেছিল। নজরুল অকস্মাৎ একদিন ঝড়ের-মাতন বিজয় কেতন নেড়ে, অট্টহাস্যে আকাশখানি ফেড়ে’ বাংলা কাব্য সাহিত্যে ‘বিদ্রোহী’র ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তার সেই দ্বিধাহীন দুর্দম দুর্বার তারুণ্যের মধ্যে আমরা দেখলাম প্রতিভা-দীপ্ত একটি সহজ কবি-মূর্তিকে। যে জীবন্ত মূর্তির অপেক্ষায় ছিলো বাংলার আধমরা অর্ধচেতন কৃষক-শ্রমিক গণমানুষ বিশেষ করে মুক্তি পাগল তরুণ সমাজ।

এ সময়ে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রেণী চেতনার দ্রুত বিকাশ ঘটে। বৃহত্তর পটভূমিতে কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের ব্যাপক প্রভাব থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন সমূহ শক্তি অর্জন করতে থাকে। সারাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। সর্বোপরি সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে সাম্রাজ্যবাদের শৃংখল মুক্তির দুর্বার আকাঙ্খা সবেগে আন্দোলিত হতে থাকে। সর্বত্র দেখা যায় এক নতুন জীবন চেতনা; বিপ্লব আসন্ন বলে প্রতিভাত হয়। শিল্প ধর্মঘট, শ্রমিক-বিপ্লব ও কৃষকদের তেভাগা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে তীব্র শ্রেণী চেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ পটভূমিতে নজরুলের কাব্য ধারা অগ্নিগর্ভ বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

যুদ্ধ-বন্যা-দুর্ভিক্ষ-শ্রেণী-শোষণ-এর যারা অসহায় শিকার, নজরুল তাদেরই কবি হয়ে দাঁড়ান। এরাই সমাজের সব চাইতে বড় অংশ। সে অর্থে নজরুল বিপ্লবের, বিদ্রোহের, নতুন সমাজ গড়ার সৈনিকে রূপান্তরিত হন। বিপ্লব ও শ্রেণী সংগ্রামে প্রেরণা নিয়ে তাদের পাশে এসে দাড়িয়েছেন তিনি; কবিতা হয়ে ওঠে তার হাতে সংগ্রামের হাতিয়ার। এরই মাঝে নারীর প্রেম ও নারী তার সাহিত্য কর্মের অন্যতম উপোজীব্য হয়ে উঠে। যুবক বয়সে নজরুল প্রতিভাবান কবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার পর জীবন জীবিকার জন্যে বিভিন্ন কাজে, বিশেষ

করে সাংবাদিকতায় নিয়োজিত থাকার ফলে নানা মানুষের সঙ্গ-সংস্পর্শ তাকে করে তুলেছিল সত্যিকারে অর্থে বৈশ্বিক চেতনায় ঋদ্ধ। নজরুল তার অঙ্গীকারের চেতনা ও বহুধরনের কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের এক পর্বে শ্রমিকদের মধ্যে বহু গুনান্বিত মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার আসন করে নেন। তার চিন্তা ও কর্ম শ্রমিকদের জীবন যুদ্ধে পরাজিত না হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ এই সময় কালে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে একজন পরম শক্তিমান কবি রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অসংখ্য কবিতা গানের সৃষ্টিতে আমাদের সাহিত্য ভান্ডারকে তিনি যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর বিদ্রোহী কবি নজরুলের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার অসাধারণ সৃজনী-প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত।

অভাবনীয় তারুন্যের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেই তিনি সহসা একদিন আমাদের কাছে ''প্রলয়োল্লাস'' নিয়ে উপস্থিত হলেন। ''প্রলয়োল্লাস'' কবিতার তিনটি ছত্র এরূপ ঃ ''তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোর সব জয়ধ্বনি কর, - ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল বৈশাখীর ঝড়। " এই কথাগুলি কবির অতর্কিত আবির্ভাবের সাথে সেদিনের বাঙালি কাব্য পাঠকেরও প্রাণের বাণী হয়ে ওঠে - সত্যিই তিনি অদৃষ্টপূর্ব নতুনের জয়ধ্বজা উড়ালেন। তার 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রকাশ বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা, এই একটি মাত্র কবিতা কবির খ্যাতি দেশময় পরিব্যাপ্ত করে দিল। বাংলা সাহিত্যে যোগ করলো এক নুতন গতিময়তা। তারপর সৈনিক কবি আর পেছন ফিরে থাকাবার অবসর পাননি। একের পর এক কবিতা একের পর এক জয়।

বিপ্লবী কবি ১৯২০ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত কমরেড মুজফ্ফর আহমদ, কমরেড আবদুল হালিমের বদৌলতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সাম্যবাদী ভাব ও চেতনার প্রভাবাধীনে ছিলেন। তাই দেখা যায়, নতুন চিন্তা-চেতনা সমন্বিত কবিতা ও গান রচনার দিক থেকে এ কালটাই ছিল নজরুল জীবনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ফসলের কাল। রাজনৈতিক কারণে এ সময়ে নজরুল পুর্ব বঙ্গে আসেন। কুমিল্লার বিরাজবালা সেনগুপ্তার তাল পুকুরস্থ বাড়ীতে স্থায়ী আস্থানা গড়েন। বাংলার একেবারে পুর্ব সীমায় কুমিল্লা জেলা শহরের অবস্থান। প্রেম হউক বা রাজনীতি হউক, নজরুল পরিণত হয়েছিলেন কুমিল্লার মাটি ও মানুষ সংলগ্ন কবিতে। বিপ্লবী ও প্রেমিক কবি দু'টোরই উদ্ভব হয়েছিল কুমিল্লাতে। কুমিল্লার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি নজরুলকে যেমন বিপুলভবে আকর্ষণ করেছে তেমনি কুমিল্লার বালিকা বধু ও যুবতী প্রেমিকাও তাকে সমভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে।

প্রাণের বিপুল বৈভব ও প্রেমের ঐশ্বর্যে তিনি স্নাত তাই বার বার কুমিল্লা ফিরে এসেছেন কবি নজরুল। কখনো বিপ্লব ও দ্রোহ এবং কখনো প্রেম ও পরিণয়ের টানে তার কুমিল্লা আসা যাওয়া। আসা যাওয়ার ফাঁক ফোকরেই নজরুল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি লিখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ময়নামতি পাহাড়ের ঢালে, লাল মাটির শক্ত বন্ধনে বিদ্রোহী কবি প্রেমিক কবিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। কুমিল্লার মাটিতে, বিজলী জরির ফিতায় বাধঁতে চাইলেন প্রিয় নারীর মেঘ রং এলো চুল, নিজ অঙ্গে মাখতে চাইলেন চন্দনসম কলংক লোকলাজ। কবিকে যর্থাথভাবে বুঝতে হলে তার কবিতাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ''নূরজাহান, নূরজাহান, সিন্ধু নদীতে ভেসে এলে-তুমি মেঘলামতির দেশে/ এনেছিলে তুমি তনুর পেয়ালা ভরি নার্গিস লায়লা গোলাব আঙ্গুর লতা শিরি ফরহাদ সিরাজের রূপকথা। / তব প্রেমে উন্মাদ ভুলিলো সেলিম সে যে রাজাধীরাজ/ চন্দনসম কলংক লোকলাজ। " বাস্তব জীবনে কুমিল্লার নার্গিস ও আশালতার মাঝে নিজেকে তিনি উপস্থাপন করেছেন সেলিমের অবয়বে। প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে কুমিল্লা তার দ্বিতীয় কাব্য।

১৯৭১ সনে যখন পুর্ব বঙ্গের বাঙালিরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত। তখন কবির অজেয় কবিতাগুচ্ছ যুদ্ধের মাঠে, ট্রেঞ্চে ও যুদ্ধের দিনগুলোতে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল অগণিত মানুষের মাঝে একই মন্ত্রে -

উষার দুয়ারে হানি আঘাত,
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল"

প্রতিরোধের সেই দীপ্ত দিনগুলোতে তার কবিতাবলি হয়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের আরেক অস্ত্র, আরেক অহংকার। তখন অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হতো নজরুলের গান। শুধু ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা কিংবা ঐতিহ্যের জাগর জিজ্ঞাসার জন্যেই নয়, নব আঙ্গিক -রচনার কৌশল-অবলম্বনে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠায় এই কবি নজরুল হয়ে উঠলেন বাঙালি গণমানুষের জীবন সংগ্রামের সঙ্গী। বিরহীর বহুস্বরতা ও সমস্বরতা বা কোরাসের যে ধারাকে

উৎসারিত করেছিলেন কবি তার কর্মজীবনের শুরু থেকেই, সেই বহু সমস্বরতা হয়ে উঠলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গণকাব্য। একথা সত্যি যে, নজরুলের এক পর্ব থেকে আরেক পর্বে উত্তরণ হয়েছে নার্গিস আমার খানম ও আশালতা সেনগুপ্তার প্রেমের কারণে। জীবন-অভিজ্ঞতাকে আরো বলীয়ান করে, আরো গভীর জীবন-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তিনি কবিতার অন্তঃশরীরে উপস্থিত করলেন ইন্দ্রিয়ানুভূতির ও নিসর্গের নতুন জগৎ। নারীপ্রেম, নিসর্গপ্রেম প্রাধান্য অর্জন করেছে এ পর্বে। সুরারিয়ালিজম এই সময়ে তার কবিতায় রূপক হয়ে সম্পূর্ণ অবয়ব অধিকার করেছিল। আত্মমগ্নতা ও অবচেতন থেকে সরে এসে তার কবিতা এ পর্বে আরো পরিণতি অর্জন করেছিল। তিরিশের দশকের নানা ঘটনা প্রবাহে স্বাধীন স্বদেশের সংগ্রাম, ফ্যাসিবাদের উত্থান, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা তার মানসভুবনকে ও কবিসত্তাকে পুর্নজন্ম দান করেছে। ১৯২৮ সালের পর নজরুলের কবিতায় দেখা দিল নতুন পালা বদল। এই পালা বদল কালে কবিতা হয়ে ওঠলো গীত। গীতিকার কবি নজরুল সমসাময়িকতো বটেই, অতীত ও আগামীর সকল কবিকে অতিক্রম করে গেলেন।

আত্মস্মৃতিতে নজরুল তার প্রেমের এই সময়কে অংকন করেছেন পরম মমতা। এ সময় অনেক অর্জন ও অপ্রাপ্তির মাঝে ব্যক্তিগত জীবনেও তার প্রেয়সি ও প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরে। জীবনে আসে আরেক নারী তবুও সময়টি ছিল খুবই তাৎপর্যপুর্ন। নার্গিসের সঙ্গে এই সময়ে এক অজ্ঞাত কারণে কবির বিয়ে ভেঙ্গে যায়। নজরুল গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েন রাজনীতির বৃত্তে। ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সমগ্র দেশে মানবিক অর্জনগুলোকে ফ্যাসিবাদ ক্লিষ্ট করা শুরু করেছে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি গুলো মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। মানুষের সকল ধরণের স্বাধীনতা বিপন্ন। ধর্মের নামে জাতীয়তার ধুয়া তুলে সকল কিছুকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছে এক শ্রেণীর নষ্ট মানুষ। বিষণ্ন নজরুল এ সময় ছায়া খোঁজেন মাতৃসম গিরিজাবালা দেবীর কাছে। গিরিজাবালা দেবীর কন্যা আশলতা সেনগুপ্তার প্রেমে পড়েন নজরুল। প্রেম রূপান্তরিত হয় পরিণয়ে। ১৯৩৩ সালে জার্মানীর হত্যাকর্তা হিটলার ও ফ্যাসিবাদ মোকাবেলায়, সাম্যবাদী শক্তি একট্টা হচ্ছে। নজরুল স্বপ্ন দেখেন আসন্ন সমাজ বিপ্লবের। তার জীবনকে এই সময়ে নিয়ন্ত্রণ করছে এক নারী তিনি নার্গিস নন, আশালতা সেনগুপ্তা।

নজরুল আশালতাকে রূপান্তরিত করেছেন প্রমীলা দেবীতে। রাক্ষস কূল বধূ মেঘনাথ জায়া নজরুলের মানস কন্যা প্রমিলা। প্রমিলা এখন নজরুল পত্নী। এই সময়ে নজরুল প্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে সঙ্গীত-সৃষ্টিতে। প্রেমের গানে, ভক্তির গানে সত্যিই তিনি নিবিষ্টচিত্ত শিল্প-সাধক। তার রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজারেরও অধিক। নজরুল ইসলামের কবিতায় একদিকে দেখা যায় কবিত্ব শক্তির অবারিত অজস্রতা, অন্যদিকে দেখা যায়, এর উচ্ছৃঙ্খল অপচয় কিন্তু সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে কবির শিল্প-সাধনা অনবদ্য হয়ে উঠে। কবিতার শিল্প সম্পর্কিত অপরিচ্ছন্নতা সঙ্গীতে তিনি বেশ দৃঢ়ভাবে কাটিয়ে উঠেন। নজরুলের সৃষ্টি অনেক। নজরুল নিজেও খুব ভাল গাইতে পারতেন। তার বহু গানের রেকর্ড রয়েছে। নজরুলের শ্যামা সঙ্গীত বিশেষ প্রসিদ্ধ। দুঃখের বিষয় নজরুল ইসলামের প্রতিভার পুর্ন বিকাশ হওয়ার পুর্বেই তিনি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে স্তব্ধ হয়ে যান। কেন তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন সে কাহিনী কঠিন রহস্য ময়তায় ঘেরা।

নজরুল কাব্যে নারীকে নিয়ে আলোচনার পুর্বে প্রথমেই স্বীকার করে নেয়া ভাল সফল ও ব্যর্থ কুমিল্লা জেলায় নজরুলের দুটো বিয়ে। প্রথম বিয়ে বাসর রাতে বলতে গেলে ভেঙ্গে গিয়েছিল। যদিও এর স্থিতিকাল ছিল প্রায় ১৬ বছর। অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে নজরুল -নার্গিসের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। ষোল বছর পরেই নজরুলের প্রথমা স্ত্রী নার্গিস আসার খানম আজিজুল হাকিম নামে জনৈক কবি ও পুস্তক ব্যবসায়ীকে ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিয়ে করেছিলেন। নার্গিসের দ্বিতীয় বিয়ে উপলক্ষ্যে নজরুল ‘পথ চলিতে যদি চকিতে কভু দেখা হয় পরাণ প্রিয়া” শীর্ষক গানখানি একটি শুভেচ্ছাপত্র হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। বলতেই হয়, আজিজুল হাকিম (১৯০৮-১৯৬২) প্রথম দিকে নজরুলের স্নেহধন্য হয়েছিলেন কবিতা লেখার কারণে।

নজরুল দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন কুমিল্লার আশলতা সেনগুপ্তাকে। দ্বিতীয় বিয়েটাই তার টিকে গিয়েছিল। দুটো বিয়েই প্রেমসঞ্জাত। এই প্রেমের কারণে নজরুল কুমিল্লায় সাহিত্য খনির সন্ধান পেয়েছিলেন। কেননা যে দু’জন মহীয়সী নারীর পানি নজরুল গ্রহণ করেন - তারা তার জীবনে একদিকে সাহিত্যের খনিরূপে, অন্যদিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন বধূ ও প্রণয়নী রূপে। প্রিয়ার রূপকলা তিনি নানা ছলে, কৌশলে এবং নানা রঙে প্রকাশ করেন- কখনো কবিতায়, কখনো গদ্যে। নজরুলের প্রায় সকল হৃদয় ছোঁয়া গান রচিত হয়েছিল এই দুই নারীকে ঘিরে। এই দুই প্রেয়সী নারীই মুলত এবং প্রধানত তার সাহিত্য প্রেরণার উৎস মুখ খুলে দিয়েছিলেন। যে এক বছরের মতো নজরুল কুমিল্লায় অতিবাহিত করেন- বিভিন্ন সময় ও কালে - এর মধ্যে রচিত অধিকাংশ কবিতা, গান, গজল ইত্যাদির উৎস কুমিল্লার আশালতা সেনগুপ্তা এবং দৌলতপুরের সৈয়দা নার্সিস আশার

খানম। এর বাইরেও অবশ্য তার কিছু সৃষ্টি আছে। তবে এই দুই নারীকে কেন্দ্র করেই নজরুল কুমিল্লায় ও দৌলতপুরে অনেক গান, কবিতা ও ছড়া রচনা করেন। এ -সব রচনাগুলি তার 'দোলন-চাঁপা' (প্রকাশকাল' আশ্বিন, ১৩৩০), 'ছায়ানট' (প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩৩২) 'পুবের হাওয়া' (প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩৩২), 'ঝিঙেফুল' (প্রকাশকাল : চৈত্র, ১৩৩৩), 'চক্রবাক' (ভাদ্র, ১৩৩৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা সাহিত্যে কবিতা, গান, গজল ইত্যাদি রচনার ক্ষেত্রে এ ধরনের পটভূমি আর কোনো কবির বেলায় খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত। একজন প্রেমিক পুরুষ দু'জন নারীকে ভালবেসেছেন এবং অকৃত্রিমভাবেই একজন বিরহীনি অন্যজন বধূ। তার প্রিয়ার রূপ বর্ণনার জন্যে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ভাষা ও ছন্দের শরীর নির্মাণ করেছেন নজরুল, তা যেমনি আকষণীয়, তেমনি মনমুগ্ধকর এবং স্মৃতি মধুর।

''তুমি দেবী, চির-শুদ্ধা তাপস কুমারী, তুমি মম চির-পূজারী!
যুগে যুগে এ পাষাণে ভাসিয়াছ ভালো,
আপনারে দাহে করি, মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা, জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি!"
(পূজারিণী/ দোলন-চাঁপা)

নজরুল তার কবিতায় ঘোষণা করেছিলেন - 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ তূর্য'। বলতেই হয় তার সার্থক রূপ আমরা তার রচনাগুলিতে প্রত্যক্ষ করি। সকল নজরুল প্রেমী ও অনুরাগী এ কথা স্বীকার করবেন, নজরুল জীবনে প্রমীলা ও নার্গিসের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত, অপ্রতিরোধ্য। ফলে তাদের প্রেরণা ও প্রোৎসাহে বাংলা সাহিত্যে নজরুল সোনা ফলাতে সমর্থ হয়েছিলেন। নজরুল প্রেমের আরেক আলেখ্য 'পূজারিনী' কবিতা। 'বিজয়িনী'-তে যে প্রেম ও পরিণয়ের ঘোষণা ও সমর্পিতভাব ছিল - 'পূজারিনীতে এসে তা স্থিতি লাভ করে।

''এ তুমি আজ সে-তুমি নহ;
আজ হেরি -তুমি ছলনাময়ী,
তুমিও হতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী।
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী,
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসেই মরি। কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?" (পূজারিণী)

'চির চেনা কবিতায়ও নজরুলের প্রেমানুভূতি সুস্পষ্ট এখানেও সে একই না পাওয়ার বিরহ বেদনা ও মূর্তি-আর্তি বাণী লাভ করেছে। একটি স্তবক -

''নাম-হারা ঐ গাঙের পারে বনের কিনারে
বেতস বেণুর বনে কে ঐ বাজায় বীণা রে॥
লতায় -পাতায় সুনীল বাগে
সে সুর সোহাগ পুলক লাগে,
সে সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়ন লীনা রে॥
আমি কাঁদি, এ সুর আমার চির চেনা রে ॥ " (চিরচেনা)

নজরুল কাব্যে প্রেম ও বিদ্রোহ প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপকালীন কবির ব্যক্তিগত জীবনের আরো একটি পরিচয় আমাদের জানতে হবে। সে হলো তার রাজনৈতিক জীবন। তিনি ছিলেন ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির বাঘা বাঘা কমরেডদের সুহৃদ, সে কারণে সাম্যবাদে বিশ্বাসী একজন মুক্তমনের মানুষ। শ্রেণী সংগ্রামে মতবাদে তিনি ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী। নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে বিপ্লব সূচিত হবে, তাতেই সকল শোষণ ও নির্যাতনের অবসান ঘটবে এ ছিল তার স্থির প্রত্যয়। এ বিশ্বাসে নজরুল বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছেন এবং শোষিত শ্রমিক ও কৃষক সমাজকে অধিকার সচেতন করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন। তৎকালীন ভারতের রাজনীতিতে সে সময় এক অস্থির কাল। একদিকে সমাজ ভাঙ্গার স্বপ্ন, অপর দিকে আরধ্যনারীর ভালবাসা নজরুলকে ভারতীয় তথা বিশ্ব নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে ভাবিত করে তুলেছিলো। নরের কাছে নারী সকল সময় ভোগ্যপণ্য। সমাজপতি, পূজারী, শিল্পসাধক বা ঘরের অতি সাধারণ জন, কোন পুরুষই নারীকে গ্রহণ করেনি শুধুই প্রেমময়ী রূপে। কেবলই শরীর সর্বস্ব নারী ভোগের বস্তুমাত্র নারী। নজরুল এই অবস্থার

পরিবর্তন চেয়েছিলেন সর্বান্তকরণে। কলম ধরে ছিলেন অবস্থার পরিবর্তনের নিমিত্তে। যদিও বাঙালি সমাজে চর্যাপদের সময়ের মতোই এখনও আমরা চিনতে বা চেনাতে পারি না নারীর প্রকৃত সত্তাকে। এখনও নারী লালসার বস্তু রূপেই বিদ্যমান। আধুনিক যুগে এসে এতে আরো যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা। নারীর প্রকৃত সত্তাকে তুলে আনতে চাইনি আমরা কখনো। নজরুল অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন কাব্যে কথায় ও গানে। নজরুলের সাহিত্যিক জীবনে কুমিল্লার মতো আরেকটি স্থানের গভীর প্রভাব ছিল সেটি কার্পাসডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা মুজিবনগর সড়কে কার্পাসডাঙ্গার অবস্থান। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের আগ পর্যন্ত কার্পাসডাঙ্গা ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটিশ আমলে এখানে একটি বড় নীলকুটি স্থাপিত হয়েছিলো। বর্তমানে ভগ্ন অবস্থায় সেটি এখনো দাড়িয়ে আছে ভৈরব নদের পাশে। ঐতিহাসিক এ কার্পাস ডাঙ্গায় দীর্ঘ দু'বছর ধরে সপরিবারে বসবাস করেছেন নজরুল। ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে পরপর দু'বছর নদী পথে কবি নজরুল সপরিবারে কার্পাসডাঙ্গায় এসেছিলেন। সঙ্গে আসা স্ত্রী প্রমীলা, দুই পুত্র সব্যসাচী ও বুলবুল এবং শাশুড়ি গিরিজাবালা দেবীকে নিয়ে উঠেছিলেন বর্তমান কার্পাসডাঙ্গার মিশনপাড়া মহল্লার হর্ষপ্রিয় বিশ্বাসের বাগানবাড়ির একটি 'আটচালা' ঘরে। কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থান কালে কবি নজরুল এ জনপদের প্রত্যন্ত পল্লী গ্রাম, মাঠ, প্রান্তর, গঞ্জ, ধূলিময় কাদাযুক্ত গ্রামীণ পথে ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দিনের অবসরে জীবন জীবিকার জন্যে কবি ঝাউ গাছের নিচে বসে গান শেখাতেন মহিম সরকারের কন্যা আভারাণীকে। এখানে নজরুল প্রেম ও সমাজ সংসার নিয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন যা বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারে অমূল্য রত্ন ও সম্পদ হয়ে রয়েছে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় কবি নজরুল কমিউনিস্ট নেতা মোজাফ্ফর আহমেদের সঙ্গে গঠন করেন 'কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি' । কার্পাস ডাঙ্গায় তখন চলছিল কৃষক আন্দোলন। ওই সময় নজরুল ইসলাম কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থান কালে গভীর রাত পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের নিয়ে গোপনে বৈঠক করতেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রিয় ব্যক্তিত্ব কবি কাজী নজরুল এবং স্বদেশী আন্দোলনের চার চার জন প্রখ্যাত নেতার বসবাসের সুবাদে এবং তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঐ সময় স্বদেশী আন্দোলনের বড় কয়েকটি জমকালো সাড়া জাগানো সভা - সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ অঞ্চলের নিভৃত পল্লী কার্পাস ডাঙ্গায়। আর এ জন্য নজরুল গবেষকরা ধারণা করেন কবি নজরুলের কার্পাস ডাঙ্গায় আসার মূল কারণ ছিল স্বদেশী আন্দোলনে তার সম্পৃক্ততা। কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের মিশন পাড়ায় কবির স্ত্রী প্রমীলা কাজী কানা মাছি ও তাস খেলতেন। পুত্র বুলবুলকে নদের ঘাটে গোসল করাতেন। কবি ভৈরব নদের ঘাটে বসে কবিতা ও গান লিখতেন। সে সময় কার্পাসডাঙ্গা বাজারঘাটে ভিড়ে থাকতো সারি সারি নৌকা, মনে হতো কার্পাসডাঙ্গা যেন একটি বন্দর। কাল চক্রের ক্রমবিবর্তনে নানা স্মৃতিময় সাক্ষী এই কার্পাসডাঙ্গাকে স্পর্শ করেছে ভারতীয় গঙ্গা সংযুক্ত শাখা খরস্রোতা ভৈরব নদী। যার ফলে কার্পাসডাঙ্গার অনেক স্মৃতি বহুল স্থান নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নিরিবিলি অবসর সময় কবি কাগজ কলম নিয়ে বসতেন বর্তমানের মিশনারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হোস্টেল সংলগ্ন ছায়া শীতল দেবদারু গাছে ঢাকা ভৈরব নদের পাড়ে স্নানঘাটের শান বাধাঁনো সিঁড়িতে। ঐ সিঁড়িতে বসেই কবি রচনা করেছিলেন অসংখ্য গান, কবিতা ও প্রবন্ধ। (কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী / এ কোন সোনারগাঁ (গান) কলসী গেল ডুবে (কবিতা), ও পদ্মগোখরো (গল্প) এবং মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস) ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য রচনাবলি। প্রসঙ্গত, ১৯৩০ সালে নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে অসাম্প্রদায়িক অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমান ও হিন্দু সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন তিনি। নজরুল গবেষকদের মতে এই উপন্যাসের পটভূমি ছিল কার্পাসডাঙ্গা। কার্পাসডাঙ্গায় সে সময় হিন্দু ধর্মের মানুষের বাস ছিল বেশী, আর এরা ছিল বেশীর ভাগ দরিদ্র ও অশিক্ষিত। সময়ে জনগণের দুঃখ ও যাতনাকে রূপায়িত করবার সাধনায় এবং তার সৃষ্টিগুচ্ছের মধ্যে দেখা যায় একদিকে নির্যাতিতের জন্যে হা হা কার, অন্যদিকে শিল্পীত নির্মাণ কৌশলের অভিনবত্ব। এভাবেই নজরুল বিশ্বের প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিলেন শ্রদ্ধেয় এক কবি।

তার সৃজনী - উৎকর্ষ, কবিতার মৌলিক অনুভব, কবিতার নির্মাণ-কৌশল ও বাক প্রতিভার প্রত্যয়ে ত্রিশপূর্ব ও পরবর্তী কবিদের মুগ্ধ করেছিলেন তিনি। তিরিশ পরবর্তী দশকে আমরা দেখতে পাই ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে বাম পন্থায় আস্থাভাজন লেখক ও কবিরা কিভাবে নিজেদের সৃষ্টি বৃত্তে জীবনের বৃহত্তর অনুষঙ্গ ও সংগ্রামী উচ্চারণ তাদের অভিব্যক্তিতে, কবিতায়, জীবনে ও মননে নতুন করে রূপায়িত করেছিলেন যা বাংলা ভাষার নজরুল পূর্ব কোন কবি করেননি। বাংলাদেশ তথা সকল বাংলাভাষী প্রেমিক ও বিপ্লবীদের আদর্শ প্রিয় কবি নজরুল।

এখন বাংলাদেশে অনেক অনুবাদ সাহিত্য পাওয়া যায়। বিশ্বের বিখ্যাত কবিদের অনেক সাহিত্য কর্ম বাংলায় অনুবাদিত হয়ে এখন আমাদের দৃষ্টি সীমায় রয়েছে। পল এলুয়ার, পাবলো নেরূদা আজকের মতো বাংলাভাষায় ব্যাপকভাবে অনুদিত হননি, তাদের সাড়াজাগানো কবিতাবলি, কবিতার নির্মাণ-কৌশল ও কাব্যের ব্যঞ্জনায় নবীন প্রণোদনা সঞ্চার করেনি। ইংরেজি ভাষায় পাঠ করতে হতো। ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন ও চেতনার মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতা যে দীপিত-বিভাব তৈরি করেছিল, বৃহত্তর বাঙালি পাঠক সমাজে তা কিন্তু কম তাৎপর্যসঞ্চারী নয়। পল এলুয়ার, লুই আরাগ এবং পাবলো নেরূদা একদা বাংলার বাইরে হয়ে উঠেছিলেন চল্লিশের কবিদের অন্যতম সহযাত্রী। যখন নজরুল বাংলায় কাব্য রচনা করে স্তব্ধ হয়ে গেছেন তার কয়েক দশক পরেই, এসব সাহিত্য বাংলায় অনুদিত হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভাষার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনুবাদ করেছিলেন নাজিম হিকমতের কবিতা। স্বদেশ থেকে তখন বিতাড়িত নাজিম হিকমত। আরেক কমিউনিষ্ট কবি, যার কবিতা ও জীবন প্রাণিত করেছিল বাঙালি কবিদের সৃজনী-উৎকর্ষে। প্রগতিশীল আন্দেলনকে সঞ্জীবিত করেছিল নাজিম হিকমতের কবিতা। হিকমতকে নিজের সত্তায় ধারণ কবিতা-নির্মাণের ও কবিতা শরীরের বাঁকবদল কালে বাঙালি পাঠক আবিস্কার করলো বিদ্রোহ আর প্রেমের জন্যে নজরুল বহুদিন পূর্বে এমনি সাহিত্য রচনা করেছেন। তাই আজো তিনি ভবিষ্যত কবিদের পথিকৃৎ।

কবির প্রথম যুগের কবিতায় ধ্বনিত হয়ে উঠে একটি প্রচন্ড বিদ্রোহ ও সুতীব্র উন্মাদনার সুর-'অগ্নিবীনা, 'বিষের বাঁশী, 'ভাঙ্গার গান', 'প্রলয় শিখা', 'ফণিমনসা', 'সর্বহারা', 'সাম্যাবাদ' প্রভৃতি কাব্যে অন্যায়-অবিচার অত্যাচার-প্রপীড়িত মানুষের পুঞ্জীভূত মূক হৃদয় বেদনাকেই তিনি অগ্নিবীণাতে স্বতোৎসারিত ছন্দ সুরে অনর্গলিত করেছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা প্রকার অসাম্য-বৈষম্যের এমন প্রবল প্রতিবাদ সে যুগে অন্য কোন কবির রচনায় ধ্বনিত হয়ে উঠেনি। ভাব-কল্পনা ও চিন্তার স্বকীয়তা, বাণী প্রকাশের বিস্ময়কর স্বতঃতূর্ততা, নির্বারিত প্রাণশক্তির উচ্ছল উদ্দামতা, সংবেদনশীল হৃদয়ের উদ্বেল, আবেগ-উচ্ছ্বাস নজরুলের কাব্যকে একটা অসামান্য বিশিষ্টতা দান করেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বিদ্রোহী নজরুলের উত্তরণ হয়েছে প্রেমিক নজরুলে। সেখানেও তিনি প্রকাশের ভাষা ভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রেম আর বিপ্লবের কবিতা রচনাকাল। সে সময়ে অখন্ড ভারত বর্ষে মহাত্ম গান্ধীজীর প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলন এবং মুসলমানদের খেলাফত আন্দোলনে দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ ও গণ জাগরণের যুগ। নজরুলের অনেক গুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হয় এই সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে। বাংলার চারণ কবি উচ্চারণ করলেন, বন্ধন হারা মুক্ত জীবনের সঙ্গীত, উদার উদাত্ত কন্ঠে তিনি দেশের মানুষকে আহ্বান জানালেন সত্যের দুর্গম পথে, বীর্যদীপ্ত মহান ত্যাগের ক্ষেত্রে।

সেদিনের রাজ রোষ কবির উন্নত শিরকে অবনত করতে পারেনি। তার লেখনীকে স্তব্ধ করতে পারেনি। সম্প্রদায়গত কিংবা জাতিভেদমূলক কোন প্রশ্ন নজরুলকে সংকীর্ণতার পথে পরিচালিত করতে পারেনি। তার নিকট মানুষই ছিল সবচেয়ে বড় কথা ঃ 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।' কবি মনুষ্যত্বের পূজারী, মানুষের বেদনাকেই তিনি ছন্দায়িত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। অন্যদিকে সমস্ত বাঙালি জাতির লাঞ্চনা অপমান তার বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান ফেনিয়ে তুলেছে। যুগের বেদনা ও উন্মাদনা অন্তরে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। সমগ্র জাতিকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে সেদিন তিনি লেখনী হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তার সে ক্ষুরধার লেখনি থেমে গিয়েছিলো মাত্র ৪৩ বছর বয়সে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। অনেক চিকিৎসার পরও তিনি রোক্তমুক্ত হতে পারেননি। সুখের বিষয় বাঙালি জাতি তাদের প্রিয় কবিকে তার প্রতিভার উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে। রোগাক্রান্ত হওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাকে 'জগত্তারিণী' পুরস্কার দেয়া হয়। ভারত সরকার তাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধে ১৯৭২ সালে ২৩শে মে কবিকে ঢাকায় আনয়ন করা সম্ভব হয়। তদবধি কবি ঢাকায় বাস করতে থাকেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'ডকটর অব লিটারেচার' সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দান করেন এবং ২১ শে' পদক দিয়ে তার প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৯৭৬-এর আগষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে তার রোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আগষ্টের ২৯ তারিখে বেলা ১০ টায় পিজি হাসপাতালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে সমাহিত করা হয়। নজরুলের কায়িক মৃত্যু হলেও সারা পৃথিবীর যেখানে অন্যায় অবিচার সেখানে প্রতিবাদী ভাষা নিয়ে নজরুল উপস্থিত, যেখানে প্রেম ভালবাসা সেখানেই প্রিয়ার প্রতি স্তুতিবাক্য আর প্রাণ ছোঁয়া মুগ্ধকর গান নিয়ে উপস্থিত নজরুল। এই প্রবন্ধের আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হলো বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব আর প্রেমের আঙ্গিনায় নজরুলের প্রদচারণার অনিবার্যতা সর্বকালে সকলের জন্যে প্রশ্নাতিত।

নজরুল কাব্যে উদ্দীপনা ও উদ্দীপক

মনোহর আলী

কোন কবির কাব্যকে কোন একটি বা দু'টি ধারা বা প্রবনতায় আবদ্ধ করা যায়না। এর কারণ-মন। মনের গতি বিচিত্র ও বহুমুখী। কবি মন অধিকতর অনভূতিপ্রবণ, সক্রিয়, সংক্রামক ও সর্বত্রগামী। এ জন্য সাধারণ মানুষের চোখে যা অনেক সময় দৃষ্টিগ্রাহ্য বা তাৎপর্যপূর্ণ নয়, কবির চোখে তা-ই অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ, সৌন্দর্যের, আনন্দের, দুঃখের বেদনার বিষয়। সেখানে থেকে রস নিংড়ে কবি আমাদের জন্য আনন্দলোক নির্মাণ করেন। এজন্য কবিদের অনুপেরণার উৎস সীমাহীন। আমরা পাঠকবৃন্ধ সীমাবদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে খন্ডিত করে কবিকে দেখি, তাঁর কাব্যকে বিচার করি। তার পেরণার উৎস খুঁজতে চেষ্টা করি। আমাদের চেষ্টা যে একেবারে পন্ডশ্রম, একথা আমি বলবো না, তবে পুর্ণাঙ্গ যে হতে পারেনা এটা বলাই বাহুল্য। এ সত্য জেনেও নজরুলের কাব্য প্রেরণার উৎস সন্ধানে আমার সামান্য অক্ষম প্রয়াস। নজরুলের রচনায় যে প্রবণতাটি সবচেয়ে সোচ্চার তা হলো স্বদেশ ও স্বদেশের মানুষ। নজরুলের রক্ত মাংস মজ্জায় ছিল দেশ,মাটি ও মানুষ।তাই দেশের কথা, মাটির কথা মানুষের কথা তাঁর কাব্যে নিখাদ আন্তরিকতায় উচ্চারিকতায় উচ্চারিত। তিনি চেয়েছিলেন মুক্তি জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ।সেই মুক্তি যে পথেই আসুক না কেন তাকে তিনি স্বাগতম জানাতে প্রস্তুত ছিলেন।এজন্য ক্ষুদিরামের সন্ত্রাসের পথ চিত্তরঞ্জন দাসের নিয়মতান্ত্রিক পথ, জামাল উদ্দিন আফগানীর প্যান ইসলামিজম এমন কি গান্ধীজীর চরকা তত্ত্ব অর্থ্যাৎ কোন পথই তাঁর কাছে অপাংক্তেয় ছিলনা । নজরুল যুদ্ধে গেলেন কৈশোরের শেষ প্রান্তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তুরস্কের উদ্ধারকর্তা কালাম আতার্তুক নজরুলের কাছে পরাধীন জাতির ত্রাণকর্তার যথার্থ আদর্শ পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। এজন্য কামাল পাশার প্রবল দেশপ্রেম মুক্ত বিচারবুদ্ধি ও উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নজরুলের প্রথম দিকের রচনায় বিশেষ ভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

''ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই "

পরিবেশ পরিস্থিতি, সময় এবং সেই সাথে কমন শত্রু নজরুলকে আরো প্রভাবিত করেছিল। তাই কামালের বিজয় যেন কবির নিজের বিজয়।একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা,অন্যদিকে,স্বদেশ প্রেমিক অকুতোভয় সৈনিকদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবোধ প্রগাঢ় মমতায় ধ্বনিত কামাল পাশা কবিতায়।

"পরের মুলুক লুঠ করে খায় ডাকাত ওরা ডাকাত
তাই ওদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত"
"আজাদ মানুষ বন্দী করে অধীন করে স্বাধীন দেশ
কুল মুলুকের কুষ্টি করে জোর দেখালে কদিন বেশ।
মোদের হাতে তুকী নাচন নাচলে তাধিন তাধিন শেষ।
বদনসিবের বরাত খাবার বরাদ্দ তাই করলে কিনা আল্লায়;
পিশাচ গুলো পড়ল এসে পাল্লায় এই পাগলদেরই পাল্লায়।"

দেশ বাঁচাতে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে হাজার সৈনিক। তাজা প্রাণের তপ্ত রক্ত দেখে বেদনায় কলজেটা থামছে ধরে।চোখে অশ্রু টলমল করে। তবু কবির সান্তনা এই জন্য যে,

"মৃত্যু এর জয় করেছে কান্না কিসের?
আবজম জম আনলে এরা আপনি পিয়ে কলসি বিষের
কে মরেছে? কান্না কিসের?
বেশ করেছ।
দেশ বাঁচাতে আপনার জান শেষ করেছ।
বেশ করেছ।
শহীদ ওরা শহীদ।
বীরের মত প্রাণ দিয়েছে খুন ওদেরই লোহিত।"

নজরুল প্রাণিত হয়েছে ওদের দ্বারা, যাদের মধ্যে ছিল মানবতার প্রতি আকুণ্ঠ সমর্থন, নির্ভেজাল উদারতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধির উদ্ধে, ও সম্প্রদায়িক চেতনার ঋদ্ধ। এজন্য সকল দেশের সকল ধর্মের সকল দেশ প্রেমিক বীর ও মানবতাবাদী মহৎ ব্যক্তিত্ব নজরুলের কাব্য সৃষ্টিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ রফিকুল ইসলামের উক্তি স্মরণ করছি-------

"পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে যে কোন মানুষের জাগরণকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন,তাদের মধ্যে বিদ্যমান আদর্শগত প্রার্থক্য তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। নিপীড়িত মানুষের জাগরণ, শোষিত মানুষের সংগ্রাম পদানত জাতি সত্বার মুক্তি যে কোন দেশের যে কোন আদর্শের হোক না কেন তা নজরুলের কাছে বন্দনার যোগ্য।ঐসব জাগরণের ভিন্ন আদর্শের ধ্বজাধারী নায়কদের তিনি সালাম জানিয়েছেন। পথ ভিন্ন হতে পারে,কিন্তু উদ্দেশ্য যখন মহৎ তখন পথের প্রার্থক্য নজরুলের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি, লক্ষই হল আসল কথা। তাই নজরুলের সাহিত্যে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম, রুশ বিপ্লব, তুর্কির নবজাগরণ, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে উপনিবেশিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম,একই সুত্রে গ্রথিত।"

নজরুল যুগকে ধারণ করেছিলেন। যুগের প্রতিটি আলোড়ন তাঁর কাব্যে উঠে এসেছে। ঘটনার মহত্তর প্রবনতাটিকেই কবিতার কাব্য নির্মানের মুল 'থিম' হিসাবে বেছে নিয়েছে। এই সাথে ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন পটভূমিতে স্বদেশ ও স্বকালের পটভূমিতে স্থাপন করে এর উপযোগিতাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন।"শাত-ইল-আরব"কবিতার উপসংহারটির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক--

"ইরাক-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,
কে জানিত কবে বঙ্গা বাহিনী
তোমার এ দুঃখে 'জননী আমার!' বলিয়া
ফেলিবে তপ্ত নীর।
রক্তক্ষীর--
পরাধীনা? একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল
দ'ফোটা ভক্ত-বীর।
শহীদের দেশ! বিদায় ! বিদায়! এ অভাগ আজি
নেয়ায় শির।"

অগ্নিবীণা কাব্যে তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও ঐতিহ্য কবির বিদ্রোহী সত্তার উদ্বোধন ঘটিয়েছিল। নিজের বন্দী জীবন, অনশনরত জীবন, উঠে এসেছে "ভাঙ্গার গান" "বিষের বাঁশী" কাব্যে। এগুলোর ভাষা যেমন তীব্র তীক্ষ্ণ, তেমনি জ্বালাময়। এ দেশের অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফাত আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক বিরোধ জনিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কবিকে প্রচন্ডভাবে বিচলিত করেছে, কবি প্রাণে আলোড়ন তুলেছে। রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব ও সাম্যবাদী দর্শন ও এর মানবতাবাদী দিকটি কবিকে প্রভাবিত করেছে প্রগাঢ়ভাবে। তাই তিনি গেয়েছেন, 'কৃষাণের' 'শ্রমিকের' 'ধীবরদের' গান। গেয়েছেন 'সাম্যের গান' বলেছেন-

"মানষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান,
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্ম জাতি
সব দেশে সবকালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।"

কবির চুড়ান্ত অনুপ্রেরণা- মানুষ। সামগ্রিক ভাবে মানবতা। তাই সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিজাত দাঙ্গা তার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এই সব দেখে কবি হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন। তারপর ও কবি দেশের নেতৃবর্গকে সাবধান করে দিয়ে উচ্চারণ করেছেন-

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোনজন
কান্ডারী ! বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।"

যুগের নানা টানাপোড়েন, সমসাময়িক সমাজের নানা ঘাত প্রতিঘাত, কবি-হৃদয়কে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। নজরুল তীব্র আবেগে অভিভূত হয়েছেন। কবিতার ভাষা ও শব্দ চয়নে ও এই আবেগকে যথাযথ ধারণ করা হয়েছে। কবি নজরুল নিজের অবস্থান সম্পর্কে অনবগত ছিলেন না। এজন্য কোথাও তার কোন ভান নেই। বরং সহজ সরল স্বীকৃতি। "আমার কৈফিয়ত" কবিতার মতো কবিতা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই। এখানে কবি নিজেকে যেন সকলের সমানে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন । শুরুতেই তিনি বলেছেন-

"বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবি
কবি ও অকবি যাহা বল ভাই মুখ বুঁজে তাই সই সবি।"

কবি ভবিষ্যতের 'নবি' হতে পারেন না, যখন দেখেন বর্তমানের বিভৎসতা, বর্তমানের অভাব, অধর্ম অনাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন।

"ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন
বেলা বয়ে যায় খায় নাক বাছা কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়।

কেঁদে বলি ওগো ভগবান তুমি আজিও আছ কি? কালিও চুন
কেন ওঠে নাক’ তাহাদের গালে, যারা খায় এই শিশুর খুন।”

আমরা জানি– জীবনের গাঢ় বেদনা থেকেই সৃষ্টি হয় অমৃত কাব্যের। শরাঘাতে নিহত ক্রৌঞ্চবধূর পাশে বেদানাকাতর ক্রৌঞ্চের পাখা ঝাঁপটানো দেখে মহাকবির কণ্ঠ থেকে প্রথম অবিভূত হয়েছিল অলৌকিক ছন্দের স্রোত। নজরুল ও আশৈশব এই দারিদ্র, বেদনা এবং সংঘাতের মধ্যেই নিরন্তর ঘর করেছেন, আর এ সবই নজরুল কাব্য রচনায় প্রাণিত করছে এবং আমাদের জন্য অলৌকিক আনন্দের খোরাক জোগাতে সাহায্য করেছে।

বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় নিটোল প্রেমের কবি নজরুল

ডাঃ মোঃ আহ্‌সান উল্লাহ্

কাজী নজরুল ইসলাম আমার প্রিয় কবি। তিনি বিদ্রোহী কবি, তারুণ্যের কবি, প্রেমের কবি। কেন যে নজরুল আমার প্রিয় কবি এর উত্তর পাতার পর পাতা লিখে গেলে ও বক্তব্য ফুরায়না, শেষ হতে পারেনা। কবির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে তারই লেখা একটি কবিতার মাধ্যমে –

“ আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি ডাকি,
সূর্য্যিমামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
হয়নি সকাল ঘুমোও এখন মা বলবেন রেগে”।

এরপর ধীরে ধীরে আমি কবিকে ভালবেসে ফেললাম। কবির এ বাণী আমার কাছে মনে হতে লাগল যেন আমার মনেরই স্বপ্ন দিয়ে বোনা এক সংকল্প–

“থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে”।

এভাবেই কবির সঙ্গে পরিচিতি হতে থাকি। তারপর আমি বড় হয়েছি। কবির অসংখ্য অগ্নিঝরা লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘঠেছে। আমি চমৎকৃত হয়েছি ; মুগ্ধ হয়েছি কবির কবিতা পড়ে। একদিন আমার হাতে এসে পড়ল কবির অমর সৃষ্ঠি “বিদ্রোহী”। গ্রোগ্রাসে পড়লাম –

আমি চির দুর্দম , দুর্বিনীত , নৃশংস,
মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন আমি ধ্বংস!
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বির.........,
আমি দুর্বার ,
আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার,
আমি অনিয়ম উচ্ছৃংখল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খলা

এবং আর ও --

কারার ঐ লৌহ–কপাট
ভেঙ্গে ফেল্ কর্‌বে লোপাট
রক্তজমাট
শিকল পুজোর পাষাণ–বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈষাণ
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশাণ
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।

জাতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতার আশ্বাস দিতে গিয়ে কবি যে বাণীর বন্দনাগীত রচনা করেছেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। নজরুল কবি হিসেবে এত বড় আর আমরা অনুসারী হিসেবে এত ছোট যে , তার সামগ্রিক প্রতিভার পরিমাপ করতে যাওয়া অনেকটা ধৃষ্টতার মতোই মনে হয় আমার কাছে।

জন্ম বাল্যকাল ঃ
১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মার নাম জাহেদা খাতুন। বাবা-মা তাকে দুখু মিঞা বলে ডাকতেন। গ্রামের মক্তবে নজরুলের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। এখানে তিনি বাংলা ছাড়াও আরবি ও ফারসীতে জ্ঞান লাভ করেন।

ছন্নছাড়া জীবন ঃ
বাল্যকাল থেকে নজরুল ছিলেন খেয়ালী ও বেপরোয়া। তাই তিনি লেখাপড়া বাদ দিয়ে লেটোগানের দলে যোগ দেন। তারপর মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে আসানসোলের এক রুটির দোকানে কাজ করেন। আসানসোলের পুলিশ ইন্সপেক্টর নজরুলের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাকে নিজগ্রামে এনে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তিন বৎসর পর নজরুল সেখানে থেকে পালিয়ে আসেন। তারপর আবার তাঁকে সিয়ারসোল স্কুলে ভর্তি করানো হয়।

সৈনিক জীবন ঃ
১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৯১৭ সালে কবি দশম শ্রেণীর ছাত্র। তার বয়স তখন ১৯বৎসর তখন তিনি সৈনিক জীবন বরণ করেন এবং বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়ে করাচি গমণ করেন। এগার বছর বয়সেই কবির কবি শক্তির স্ফূরণ ঘটে।

কবি শক্তির স্ফূরণ ঘটে। যুদ্ধে যোগদান করলেও কাব্য চর্চায় তাঁর কমতি ছিলনা। সে সময় ফরাসী সাহিত্যের সাথে তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত হন।

সাহিত্যেক নজরুল ঃ
গল্প রচনার মধ্যে দিয়েই কবি নজরুলের লেখক জীবনের সূচনা। উপন্যাস ও তিনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু গল্প উপন্যাসের ওপর নজরুলের সাহিত্যের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত নয়। তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি কবি। তাঁর প্রথম কবিতা আত্মপ্রকাশ করে ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়। নাম মুক্তি। ১৯১৯ সালে কবি করাচী হতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। যে কবিতাটি রচনা করে নজরুল অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তার নাম ''বিদ্রোহী''। ১৯২০ সালে "মোসলেম ভারত" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর হতে অজস্র রচনায় কবি বাঙালি পাঠককে একেবারে বিস্ময়াভিভূত করে তুলেছেন। বিদ্রোহী কবি রূপেঃ
ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, দেশ ও জাতির মুক্তির পক্ষে কলম ধরলেন কবি। নজরুলের শ্রেষ্ঠতম কবিতা "বিদ্রোহী" এবং তিনি "বিদ্রোহী কবি" হিসেবে পেলেন স্বীকৃতি। কবি তাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করলেন-

"প্রার্থনা কর যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মানুষের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

প্রেম ও সাম্যের পুজারী ঃ
নজরুল শুধু বিদ্রোহ আর ভাঙ্গানের কথাই বলেননি।প্রেমের কথাও বলেছেন। প্রেম নজরুলের কবিতার এক বিশিষ্ট রূপ । বিদ্রোহী কবিতার মধ্যে ওএই প্রেমের প্রকাশ স্পষ্ট।

"আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি,ছল করে দেখা অনুখ
আমি চপল মেয়ের ভালবাসা তার কাঁকন চুড়ির কনকন ।"

দোলন চাঁপার প্রথম কবিতা"দোদুল দুল" -এ কবি প্রিয়ার তুলনাহীন রূপ বর্ণনা করেছেন। প্রিয়ার বাহিরের রূপ ব্যাখ্যা দেহত্ববাদী কবিতার অন্যতম উপহার-

হাসির ভাস
ব্যাথার শ্বাস
চপল চোখ
আঁখির লাশ

নয়ন নীর
অধর ফুল
রাতুল তুল
দোদুল দুল
দোদুল দুল!

প্রেমিকের চোখে প্রিয়া সব সময়ই দ্বিতীয় রহিত ওতুলনাহীন। লড়যহ গধংবভরবষফ এর কথায় ও এর স্বীকৃতি রয়েছে-

নঁঃ ঃযব ষড়াবষরবংঃ ঃযরহমং ড়ভ নবধঁঃু মড়ফ বাবৎ
যধং গেড়বিফ ঃড় সব অৎব যবৎ ড়রপব,ধহফ যবৎ যধরৎ ধহফ বুবং ধহফ
ঃযব ফবধৎ ৎবফ পঁৎাব ড়ভ যবৎ ষরঢ়ং”

এই পৃথিবীতে বর্তমান জীবনের খন্ডমিলন যেন নতুন জীবনের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে,এবারের ব্যর্থ আশা যেন সফল প্রেমের সঙ্গো মিশ্রিত হয়। এ কবির আকুল প্রার্থনা।

“এমনি আদর, এমনি হেলা,
মান-অভিমান ,এমনি খেলা
এমনি ব্যাথার বিদায় বেলা
এমনি চুমু হেসে
যেন খন্ড মিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে”

সাধারণের কবি ঃ

দেশের সাধারণ মানুষের লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন কবির বুকে কঠিন সায়কের মতো বিধেছে। কবির হৃদপদ্ম তাতে রক্তাক্ত হয়েছে। ফলে সুতীব্র অনুভূতির উজ্জীবন ঘটেছে-

“বন্ধুগো বলতে পারিনা-
বড় বিষ জ্বালা এই বুকে
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি তাই
যাহা আসে কই মুখে
রক্ত ঝরাতে পারিনা তো একা
তাই লিখে যাই রক্ত লেখা”।

ছোটদের কবি নজরুলঃ

কবি নজরুল ইসলাম বড়দের জন্যই কবিতা লিখেন নি বরং ছোটদের জন্য ও তিনি বহু কবিতা লিখেছেন। যেমনঃ

“কাঠবিড়ালী ,কাঠবিড়ালী, পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও; বাতাবী লেবু লাউ
বেড়াল বাচ্চা কুকুর ছানা তাও”

-(খুকু ও কাঠবিড়ালী)

‘নবার নামতা পাঠ’ -এ ছোটদের মনের কথাই যেন নামতাকারে ফুটিয়ে তুলেছেন-

‘এককেকে এক
বাবা কোথায়, দেখ।
দুয়েক কে দুই;
নেই ক? একটু শুই;

নজরুলের শিশুমন শিশুদের মনের সাথে একাত্ম হয়েই বলল-

“আমি যদি বাবা হতাম,বাবা হত খোকা
না হলে তার নামতা পড়া মারতাম মাথায় টোকা।”

এভাবে তিনি ছোটদের মাঝে আজও বেঁচে আছেন।

কবি প্রতিভা ঃ

নজরুল বিচিএ প্রতিভার অধিকারী কবি। কোথাও তিনি প্রেমের কবি, কোথাও বিরহের, কোথা ও তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন ইসলামী চেতনায়। আবার কোথাও আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত করেছেন। নব নব ভাব সৃষ্টির লহরীতে তিনি যেভাবে আমাদের রসগ্রাহী মনকে আন্দোলিত করেছেন, তার তুলনা হয় না। সৃষ্টি বৈচিত্র্যে তিনি অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের মতই তিনি মহৎ কবি, বড় মাপের কবি। নজরুল কাব্যে আছে বিপুল প্রাণাবেগ আছে সাম্য, মৈত্রী ও মানবতার বাণী।

অন্যান্য দিক ঃ
নজরুল প্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ পেয়েছে সঙ্গীত সৃষ্টিতে। প্রেমের গানে, ভক্তির গানে সত্যিই তিনি নিবিষ্ট চিত্তে শিল্পী সাধক। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কম নয়। নজরুলের শ্যাম সঙ্গীত বিশেষ প্রসিদ্ধ। নজরুল ইসলামের কবিতায় একদিকে দেখা যায় কবিত্ব শক্তির অবারিত অজস্রতা অন্য দিকে দেখা যায় এ উচ্ছৃংখল অপচয়। কিন্তু, সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে কবির শিল্প সাধনা অনবদ্য হয়ে ওঠেছে। তা কবিতার শিল্প সম্পর্কিত অপরিচ্ছন্নতা সঙ্গীতে তিনি অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

রচনাবলী ঃ
অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, দোলনচাঁপা, ছায়ানট, সর্বহারা ভাঙ্গার গান, সঞ্চিতা, ফণিমনসা ইত্যাদি কবির উল্লেখযোগ্য কবিতা গ্রন্থ। বিদ্রোহী কবি, তারুণ্যের কবি, সাম্যবাদী কবি হিসেবে নজরুল ব্যাপক পরিচিত হলেও তার আরও একটি বিশেষ পরিচয় আছে। নজরুল প্রেমের কবি। ''দোলনচাঁপা", ''ছায়ানট", "চক্রবাক" সিন্ধু হিন্দোল" ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে তার পরিচয় ফুটে বেড়িয়েছে। তাছাড়া আলেয়া, ঝিলিমিলি প্রভৃতি নাটক ও ব্যথার দান, বাঁধন হারা, মৃত্যুক্ষুধা প্রভৃতি উপন্যাস তার অপুর্ব অবদান। এদেশে মুসলমান জনগণকে ইসলামের অতীত গৌরব ও শৌর্য বীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন ইসলামী ঐতিহ্যমন্ডিত তার অসংখ্য কবিতায় । সামগ্রিক মুসলিম বিশ্বের পটভূমিকায় তাই আমরা শুনি কবির উচ্চারণ–

" ওরে আয়
ঐ মহা সিন্ধুর পার হতে ঘন রণভেরী শোনা যায়
ওরে আয়
ঐ ইসলাম ডুবে যায়।

শেষ জীবনঃ
১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কবি মস্তিষ্কের পক্ষ্যাঘাতে আক্রান্ত হয়ে জীবনস্মৃতি অবস্থায় ছিলেন। ১৯৫২ খৃঃ দেশবাসী চাঁদা তুলে তাকে বিলাত পাঠান। কিন্তু ইউরোপের স্বনামধন্য চিকিৎসকেরা এ অভিমত প্রকাশ করলেন কবির রোগ নিরাময়ের কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর কবিকে কলিকাতায় ফিরে আনা হয়। তখন তাকে ১৯৭২ সালে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কবি কলিকাতায় বাস করছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালের মে মাসে কবিকে বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশে আনেন। তখন হতে কবি ঢাকাতে বাস করতে থাকেন। ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে বাংলা সাহিত্যে ডক্টরেট খেতাব প্রদান করে। ১৯৭৬ সালে কবিকে বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশের জাতীয়তা দান করেন এবং ঐ বছরের ফেব্রুয়ারীতে তাকে ২১শে পদক প্রদান করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ শে আগস্ট সকালে ১০ ঘটিকায় কবি ঢাকায় পিজি হাসপাতালে ইহলোক ত্যাগ করেন। বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করেন।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের অবদানের কথা লিখে শেষ করা যায় না। তিনি পরাধীন মানুষের মুক্তিকামী কবি। তিনি মুসলিম জাগরণের কবি। নিপীড়িত,শাসিত মানুষের জন্য পৃথিবীতে যে কত কবি আত্মোৎসর্গ করে গেছেন তা বলা যায় না। নজরুল তাদের অন্যতম। বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় নিটোল প্রেমের কবি নজরুল। তাই আমার ও প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আজ কবি নেই। তাঁর অমর কাব্যগুলো । তাঁর সৃষ্টিগুলো আজও আমাকে ডাকে সাহিত্যাকাশে। তাইতো আমিওকবির ভাষায় বলি–

"হে কবি নীরব কেন ফাল্গুন যে এসেছে ধরায়
বসন্তে ভরিয়া তুলি লবেনা কি তব বন্দনায়?"

লেখক ঃ কবি/কলামিস্ট/কথাশিল্পী

সমকালীন প্রসঙ্গ
নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

এখন সময়ের দাবী

মাহমুদুল হাসান বাতেন

শিল্পের অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্ব পূর্ন শাখা হিসেবে 'সাহিত্য' অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় ইদানিং বহুল পরিচিত। আধুনিক ইলেকট্রিক মিডিয়ার বরকতে সাহিত্য চর্চাও দেশ কাল ও সময়ের গন্ডি পেরিয়ে গেছে। কিন্তু সেই তুলনায় মাহ-মাগিতুল্য সুস্থ সাহিত্য রচনাকারী সকল কবি সাহিত্যিকদের মুল্যায়নের ব্যাপারে বিগত সকল যুগ যামানার লোকদের চেয়ে আমরা অনেকটা পিছিয়ে রয়েছি। আর কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য কর্মের এই অব সুল্যায়নের ফলে আমদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম , বস্তা পচা নগ্ন সাহিত্য চর্চার মেতে উঠে গোটা জাতির চারিত্রিক অবক্ষয় ডেকে আনছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সু-মহান সাহিত্য কর্মের অবমুল্যায়নের মাধ্যমেই উল্লেখিত বিষয়টির সুষ্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায়।

সাহিত্যাকাশে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ধুমকেতরি মতই আকস্মিক। কিন্তু সেই ধুমকেতু রূপী নজরুলের ঢেলে দেয়া সাহিত্য রসে বাংলা সাহিত্যের মরা গাঙ্গে ভরা জোয়ার সৃষ্টি করে গেছে। তারই ফলশ্রুতিতে, আজ আমাদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, শত সহস্র তারকা খচিত, জোস্না-স্নাত শুভ্র আকাশ। কবি নজরুলের তারূণ্যজ্জ্বল জীবন থেকে প্রেরণা খুঁজে পেয়ে আজো সচল রেয়ছে হাজারো মাসীর জীবন চক্র। নজরুলের ব্যথা ভরা শৈশব কৈশর আজো শান্তনা দিয়ে যার লাখো তরুনের অন্তরাত্মাকে।

একথা শাশ্বত সত্য যে, কবি নজরুল ইসলাম গোটা বাঙ্গালী জাতির মাঝে যতটুকু প্রান সঞ্চার করে গেছেন অন্য কোন কবি সাহিত্যকের পক্ষে তা হয়তো বা সম্ভব হবে না। তাইতো আল্লামা রুহুল আমীন খানের কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ঃ

যুগ যামানা পাল্টে দিতে
চাইনা অনেক জন
এক মানুষই আনতে পারে
জাতির জাগরন।

প্রিয় পাঠক! নজরুল একটি বহুমুখী প্রতিভার নাম। তিনি তার প্রতিভাকে কখনো গানের সুরে, কখনো কবিতার ছন্দে, আবার কখনোবা অগ্নিবীনার শেল ঝরিয়ে বাতিলে বুককে ঝাঁঝরা করে দিয়েছেন। যারা সর্বহারা, রিক্ত-তাদেরকে সচেতন করনার্থেই তিনি কলম চালিয়ে ছিলেন। তাই তার কবিতা ও সঙ্গীত এদেশের কুলি মজুরদের আধার জীবনে আলোর গান গেয়েছে। তিনি নিপিড়িত নির্যাতিত ও হতভাগ্য জাতিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও অপমানের হাত থেকে বাচাবার জন্য বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছেন। তাইতো কবির অগ্নিবীনায় ঝংকৃত হয়েছে ঃ

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা
অত্যাচারীর খড়গ কৃপান
ভীম রন ভূমে রণিবেনা,
বিদ্রোহী সেইদিন হব শান্ত

নজরুল একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ ও বটে ; পুঞ্জীভুত অন্যায় অবিচার জগদ্দল পাথরের ন্যায় মজলুম মানুষের বুকে চেপে গিয়ে তাদের আর্ত হাহাকারে যখন আকাশ বাতাস সিক্ত হয়ে উঠেছিল, নরশাদুল নজরুল তখন হায়দারী হাঁক ছেড়ে বলেছিলেন ঃ

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল করবে লোপাট

নজরুল শুধু বিদ্রাহীই ছিলেন না, তিনি একাধারে ছিলেন একজন প্রগতিবাদী, মর্দে মুমিন ও সাম্যবাদী কবি। তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন এভাবে ঃ

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নয়, নহে কিছু মহিয়ান

- ধর্মীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি গেয়ে উঠেছেন।

ইসলাম সে তো পরশ মানিক
তারে কে পেয়েছে খুঁজি

পরশে তারি সোনা হল যারা
তারেই তো মোরা বুঝি।

আশেকে রাসুল, কবি নজরুল রাসুলের (সাঃ) প্রেমে পাগল হয়ে সুর তুলেছেন এভাবে ঃ

তৌহিদের মুর্শিদ আমার
মোহাম্মাদের নাম
মুর্শিদ মোহাম্মাদের নাম

এমনিভাবে নজরুল ইসলাম নবীজীর প্রকৃতরুপ তুলে ধরেছেন তার অসংখ্য কাব্যের মধ্য দিয়েও। নজরুলের সাহিত্য সাধনার কাল মোট (১৯১৯-১৯৪২) ২৩ বছর। এই স্বপ্ন সময়ে তিনি দৈনিক নবযুগ" অর্ধ সাপ্তাহিক ''ধুমকেতু" পত্রিকা সম্পাদনা ও সাপ্তাহিক ''লাঙ্গাল" পত্রিকা পরিচালনা সহ অজস্র রসোত্তীর্ণ নাগ রচনা এবং অর্ধ শতাধিক (কবিতা-গান-নাটক প্রবন্ধ এবং উপন্যাসের) বই উপহার দিয়ে নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে পুর্নাঙ্গা ও সমৃদ্ধ করে গেছেন। কাজী নজরুল ইসলামই একমাত্র কবি, যিনি জনগণের জীবন যাত্রার সাথে দেশীয় কাব্য ধারার সমন্বয় সাধন করতে সমর্থ হয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি বাঙ্গালী জাতির নয়নমনি হিসেবে পরিণত হয়েছেন। তিনি বাঙ্গালী জাতির জাগরণে সাহিত্য সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলেই তাকে জাতীয় কবির বিশেষ মর্যাদায় ভুষিত করা হয়েছে কিন্তু এই মযার্দা দিয়েই কি কর্তব্যের সবটুকু শেষ হয়ে গেছে? না তা আদৌ নয়।

কবি নজরুল আজ আমাদের মাঝে নেই ঠিকই, কিন্তু তার রেখে যাওয়া স্মৃতিও অমর সাহিত্য কর্ম আজো আমাদের মাঝে রয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, তার স্মৃতিও সাহিত্য কর্মগুলো আজ শুধুই অবহেলিত বিষয় হয়ে পড়ে আছে। জাতির এই প্রাণ পুরুষের স্মৃতি ও শিল্প কর্ম রক্ষায় সরকার ও এগিয়ে আসছে না। আর না এগিয়ে আসছে কোন ব্যক্তি বা সংগঠন। নজরুলের রচনাবলীরও তেমন কোন প্রচার প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বিভিন্ন বই মেলায় তো নজরুলের (দু/একটা ছাড়া) বই খুঁজে পাওয়া দুস্থর। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম তো নজরুলের নামই সহ্য করতে পারে না; তাারা মত্ত্ব আছে হুমায়ুন, মাশসুর ও মিলনদেরকে নিয়ে এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, রেডিও টেলিভিশনে নজরূল কে তেমন একটা মুল্যায়ন করা হয় না। নজরুলের জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয় অত্যন্ত ঢিলেঢালা ভাবে। রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম ও সংবাদ পত্রগুলো নামকা ওয়াস্তে কিছু ......।
পক্ষান্তরে রবীঠাকুরের জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী আসার অনেক আগে থেকেই প্রচার প্রসার করে জাক জমকের সাথে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে জাঁক জমকের সাথে অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে জাতীয় কবির প্রতি কেন এই বৈরিতা আমার বোধ গম্য নয়। এর স্বপক্ষে কারো হাত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার সময় এসছে।

এই মহাকবির তিরোধানের আজ প্রায় দুই যুগ হতে চলল; কিন্তু তবুও এদেশের মানুষের প্রাণের দাবী .... অদ্যবধি প্রতিষ্ঠার মুখ দেখলো না । কবি নিজেই বলেছিলেন,
আমি চিরতরে দরে চলে যাব
তবু আমার দেবোনা ভুলিতে

কবির উল্লেখিত কাব্য বাণী শুনে প্রশ্ন জাগাটাই স্বাভাবিক যে, নজরুলের আপনার সাধ অপুর্ণ থেকে গিয়ে বিরুদ্ধাবাদীদের সাধই কি পুর্ণ হবে? যারা নজরুলকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন,
''তোরে লোকে ভুলে যাবে;
দেয়ালের দগ্ধ মসি রেখা
তার চেয়ে বেশি কিছু তোর নামে
নাহি রবে লেখা।
অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং ব্যক্তি সমাজ দেশ-জাতি সকলের উদ্দেশ্যই এক-ই-আহবান।

আসুন, আমাদের প্রাণপুরুষের শিল্পকর্মের প্রচার প্রসার সংরক্ষণ ও তার স্মৃতি রক্ষায় এখন তৎপর হই। নতুবা নজরুল বিদ্বেষীরা তার নাম নিশানা ও বাকী রাখবে না।

হারাতে চাইনা

পীযুষ কান্তিরায় চৌধুরী

"আল্লাহ্ তে যার পুর্ণ ঈমান
কোথা সে মুসলমান......।"

কবির আক্ষেপ মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর কারনটা বিস্তর। কবি যদিও মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু ভাব ধারাটা ছিলো সবাই আমরা মানুষ কোথায় হিন্দু-কোথায় মুসলমান-কোথায় বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান। তিনি উর্দু-ফার্সী, সংস্কৃত, বাংলা, এ সকল ভাষা গুলি রপ্ত করে আয়ত্ব করেছিলেন। হিন্দুদের কালী-দুর্গা-স্বরস্বতী দেব-দেবী নিয়ে অসংখ্য কবিতা, গান- গল্প লিখেছেন। পাঠক বৃন্দ, আমি প্রথমেই কবির আক্ষেপ নিয়ে লিখলাম সম্প্রদায় কে নিয়ে একটু কলমের আচড় দিয়েছি। এই কবিকে চেনা-জানার মানুষ নেই এমন টি কল্পনা করা যায় না। তবুও পরিচিতি না লিখলে বর্তমান প্রজন্ম, যেমনটি জগা-খিচুড়ী স্বাধীনতার ইতিহাস পড়ছে। আজ এক জাতির পিতা, স্বাধীনতা ঘোষক। আবার কাল একজন জাতীর পিতা, ঘোষক কোনটি ঠিক, সঠিক ইতিহাস পেতে ৩৪ বছর কেটে গেলো। আর কত দিন ? বাংলা একাডেমি, বুদ্ধিজীবি, বিশিষ্ট লেখাকবৃন্দ রাজনৈতিক গেড়া কলে বন্ধি। যাক সে প্রসংগে আর যাচ্ছিনা। কবির পরিচিতি হচ্ছে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি, সাম্যের কবি। অগ্নিস্ফলিংগের মত তার লেখনি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতো। ইংরেজদের মসনদ কাপিয়ে দিতো। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই ভারতবর্ষে ২য় স্থান দিয়েছেন কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। আমরা বরণ করে স্মরন করি জাতীয় কবি নজরুলকে রণ সঙ্গীত "চল, চল, চল-- উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল--।" মুক্তি যুদ্ধে চেতনার রণ সঙ্গীত- "কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট---।"

কবি নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা কাজী ফকির আহমদ, মাতা জায়েদা খাতুন, ছোট বেলায় মাতা-পিতাকে হারাতে হয় তাই তার আর এক নাম দুঃখু মিয়া, লেখা পড়া দশম শ্রেনী পর্যন্ত। মসজিদের ইমামতী, মক্তবে লেখাপড়া, মাজারে খাদেম গিরি। আবার প্রাইমারী, হাইস্কুলে লেখাপড়ায়, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, লেটোগান রচনা, রুটির দোকানের কর্মচারী, হাবিলদার ভারতীয় সেনা বাহিনীর ৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৭ খ্রি:)। তিনি কবি হাফিজ, ওমর খৈয়াম এর কিছু কিছু রুবাঈ পড়েছেন অনুবাদও করলেন। কাজী নজরুল ইসলামের জীবন পঞ্জি বিশাল লিখে শেষ করা যাবে না। অসংখ্য গান রচনা-সুর তৈরি করে আমাদের কে উপহার দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বেশ সম্মান করতেন, তাঁর লেখনিতে খুব প্রশংসা করতেন। কবি নজরুল ইসলাম একবার ধর্মীয় ভাবে নির্গৃহীত হয়ে ছিলেন। ইসলাম ধর্মের নামে লেবাস পড়ে আল্লাহ্কে ভুলে গিয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডে কবি যখন তার কবিতায় অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখিয়েছেন। তখন তার উপর নেমে আসে মৌলবাদের থাবা। আজো সেই গন্ধটা পাওয়া যায়। তিনি মানুষের ধর্ম বিচার করে একবার মুসলিম ধর্মের নার্গিসকে বিয়েতে আবদ্ধ করেন। আবার হিন্দু ধর্মের প্রমিলা দেবীকে বিয়ে করেন। যার যার ধর্মের কর্ম নিয়েই সংসার করেছেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই সমাদৃত ছিলেন। শুধু একটি শ্রেনী ধর্মের দোহাই দিয়ে তাকে খাটো করে রাখতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করছেনা। কিন্তু আবার তার ইসলামিক গান, গজল, হাম,নাত, গুলি কত সুন্দর করে বিভিন্ন ধর্মিয় অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করে গেয়ে থাকেন। যেমন-

(১) "রমজানেরই রোজার শেষে
এলো খুঁশির ঈদ-----"
(২) "ত্রিভুবনে প্রিয় মুহাম্মদ
এলোরে দুনিয়ায়
আয়রে আকাশ, আয়রে বাতাস
দেখবি যদি আয়----"
(৩) খেলছি এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু
আনমনে----।।
(৪) দুঃখ যে মনের মাঝে
হানিল আমায়
তারে নি ভালো বাসিবে
খোদায়"।

কবি তার লেখনীতে রেকর্ড সংখ্যক সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং সুর সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ভক্তিগীতি। আবার ভক্তিগীতির এক তৃতীয়াংশ ইসলামিক। সুতরাং কাজী নজরুল ইসলামকে যারা খাটো করে দেখতে চায় তাঁরা কোন দিন ফলপ্রসু হবে না। নজরুল ইসলাম জাতির কবি জাতীয় কবি। "মিথ্যা শুনিনি ভাই এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই।" কবি আক্ষেপের সুরেই বলেছেন।

এখন আমার দীর্ঘ দিনের একটি আক্ষেপের কথা না লিখে পারছিনা। প্রতি নিয়ত চিন্তা করলে নিজকে ছোট ভাবি। সে প্রসংগটি হচ্ছে -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব কবি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আমাদের জাতির কবি, জাতীয় কবি। তাঁর কবিতা, গান, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প নিয়ে ভারতে একটি গবেষনাগার শিক্ষালয় "শান্তি নিকেতন" আছে তা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন বড় বড় শহরে যেমন- রাশিয়া, আমেরিকা, ইটালী, ইত্যাদি স্থানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষনা করেন তার লেখনি, গান নিয়ে, আমাদের দেশে বেসরকারী ভাবে আছে "ছায়ানট" নামে একটি প্রতিষ্ঠান, কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, কুটিবাড়ি, কাচারী বাড়ি, প্রতি বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধরে রেখেছেন। আবার প্রতি বছর রবীন্দ্র সম্মেলন করে বাঙ্গালী সংস্কৃতি সাহিত্য কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে চলছে তার কর্মকান্ডের গবেষণা ও উদ্বুদ্ধ করন। যারা বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী তাঁরা আজ রবীন্দ্র সম্মেলনে সর্বাত্বক সাহায্য সহযোগীতা করে যাচ্ছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমাদের ২য় জাতীয় কবি নজরুল ইসলামকে এতো খাটো করে দেখছি কেন ? নজরুল ইসলামকে আমরা স্বাধীন দেশে নিয়ে এসেছি বাকরুদ্ধ অবস্থায়, বাংলাদেশের মাটিতে পা রেখে ডাগর ডাগর চোখে চেয়ে দেখলেন চিরপরিচিত বাংলার রূপকে এবং মানুষগুলিকে কি যেন বলতে চেয়েছিলেন, ঠোট দুটি,নেড়ে কিন্তু পারেননি তিনি বাকরুদ্ধ বাংলার বুলবুল নজরুল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এ দেশেই সোনার বাংলায়।

১৯৭৬ খ্রি: ঢাকায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গানে নজরুল ইসলাম কে কবরস্ত করা হয়। তার মৃত্যুর পর আজ প্রায় ৩৪ বছর পার হয়েছে কিন্তু ১১ই জৈষ্ঠ জন্ম দিন জাতীয় মর্যাদায় ঘটা করে পালন করা হয়। আর ১২ই ভাদ্র মৃত্যু দিবস কে যেকোন ভাবে স্মরন করা হয় কেন ? নজরুল ইসলাম বেশী সময় অতিবাহিত করেন কুমিল্লাতে। তাই কুমিল্লা জেলাবাসী ১৯৭৭ সালে বেশ ঘটা করে নজরুল পরিষদ তৈরি করে সংগীত, নৃত্য, কবিতা বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগীতা করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গীতিকার সুরকার কাদের জামেরী, মোস্তফা জামান আব্বাসি এবং চট্রগ্রাম বেতারের একজন কর্মকর্তা (নাম মনে নেই)। যাই হোক, ঢাকা বুলবুল ললিত কলা একাডেমি একমাত্র বাংলাদেশের নজরুল সংগীতের শিক্ষালয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ দুটি প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলো না একটি জাতীয় ভাবে সম্মেলন করার। বড় দুঃখ হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা গুলিতে সংগীত বিদ্যালয় আছে। শিক্ষক বৃন্দ নজরুল সংগীত চর্চা করান এবং জাতীয় আঞ্চলিক জেলাগুলিতে নজরুলগীতির একটি বিষয় অন্তরভুক্ত থাকে। এখানে আমি বলতে চাই অন্তত কুমিল্লা নজরুল পরিষদ এবং বুলবুল লালিত কলা একাডেমি একত্রিত হয়ে একটি কমিটি করে উপজেলা, জেলার শিল্পকলা একাডেমি গুলির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে ছোট ছোট সম্মেলন করে একটি জাতীয় সম্মেলন করা যায়। যদি তাইনা পারি তবে নজরুল আমাদের দেশ থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। কারন আমরা দেশকে সবাই ভালবাসতে চাইলেও পারছিনা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে সংস্কৃতির উপর শকুনী থাবা বিস্তার করে বসে আছে। যাত্রা, থিয়েটার আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ কিন্তু তা বন্ধ করে দেবার পায়তাড়া চালিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে বোমা ফাটিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। যাত্রা থিয়েটারে নজরুলের বিভিন্ন সঙ্গীত কি নেই ? কেন বাদ যাবে যাত্রা, থিয়েটার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি ?

আজ বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় কঠিন একটি পথ অতিক্রম করছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজনীতি করে দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আসুন সংস্কৃতি রক্ষা ও নজরুল ইসলামের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গীত এবং মাজার রক্ষা করা ও প্রতিবছর একটি নজরুল সম্মেলন করে টিকিয়ে রাখি জাতীয় কবিকে। উর্দ্ধে তুলে ধরি যেন হায়িয়ে না যায়। এই হউক শপথ।

আলীম পাড়া, মহসীন রোড
চাঁদপুর
১৫.৩০.০৫

নজরুল ইসলামের অনন্য কীর্তি–তার সৃষ্টি রাগ

রূপালী চম্পক

বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নজরুল একাধারে কবি, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার কিন্তু তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল সংগীত এবং এই সংগীতের জগতে তিনি সুমহান সম্রাটের মতই স্ব মহিমায় বিরাজমান।

নজরুলের সংগীত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন পর্যায় হচ্ছে রাগভিত্তিক গান সৃষ্টির পর্ব। ভারতীয় মার্গ সংগীতে নজরুলের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল এবং তিনি জমিরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে নিয়মিত তালিম ও নিয়ে ছিলেন, খাঁ সাহেবের শোক সভায় নজরুল ইসলাম বলেছিলেন "আমি ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের একজন দীনভক্ত সাগরেদ" তাই দেখা যায় যে নজরুল গীতিতে ব্যাপক ভাবে রাগের প্রভাব পরেছে। নজরুল বিশুদ্ধ রাগ অবলম্বনে কিছু হিন্দুস্থানী বনদিশ এর উপর বাংলা কথা বসিয়ে বাংলা খেয়াল রচনার সূত্রপাত করেন, যেমন–"জয়জয়ন্তীতে"– দুরে বেনু কুঞ্জে "মেঘ" এ–গগনে সঘন চমকিছে দামিনী। "বাহারে"– পিউ পিউ বোলে প্রভৃতি।

রাগ সংগীত যে নজরুল ইসলামকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা–তাঁর এই উক্তির মাধ্যমেই সৃষ্ট বোঝা যায়। "আধুনিক গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশী অনুভব করি তা হচ্ছে সিমিট্রি সামঞ্জস্য বা উইনিফরমিটির (সমতা) অভাব। কোন রাগ রাগিনীর সংগে অন্য রাগ রাগিনীর মিশ্রন ঘটাতে হলে সঙ্গীত শাস্ত্রে যে সুক্ষ জ্ঞান বা রসবোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগিনী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগিনী যদি তার গ্রহ ও ন্যাস এবং বাদী, বিবাদী ও সম্বাদী মেনে নিয়ে সে রাস্তায় চলে তাহলে তাতে কখনো সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবেনা।

ক্লাসিকেল ও উচ্চাঙ্গঁ সংগীতে যে অভিনব রস সৃষ্টি হতে পারে মানুষের মনকে 'মহতো মহীয়ান' করতে পারে তা আধুনিক সুরের একঘেয়ে চপলতায় সম্ভব হতে পারেনা। (পুর্বাবাস নজরুল গীতি অন্বেষা, সম্পাদনা কল্পতরু সেনগুপ্ত)।

রাগ ভিত্তিক অনেক গান নজরুল ইসলাম রচনা করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন রাগের মধ্যে মিশ্রন ঘটিয়ে ও তিনি সুরের বৈচিত্র সাধন করেছেন। শুদ্ধ রাগ নির্ভর ছাড়া ও তিনি কয়েকটি নতুন রাগও সৃষ্টি করেছেন। এ কথা বলা বাহুল্য যে শাস্ত্রীয় সংগীতে খুব গভীর জ্ঞান না থাকলে নতুন রাগ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই কাজটির মাধ্যমেই বোঝা যায় যে শাস্ত্রীয় সংগীতে নজরুল ইসলাম কতটা পারঙ্গম ছিলেন।

নজরুল ইসলাম সৃষ্টি রাগগুলির নাম হচ্ছে দোলন চাঁপা, দেবযানী, মীনাক্ষী, অরুনরাজ্ঞনী, রূপমঞ্জুরী, নির্ঝবিনী, সন্দামালতী অরুন ভৈরব, বনকুন্তলা, শঙ্করী, শিবানী ভৈরবী, যোগিনী, রুদ্র ভৈরব, আশা ভৈরবী, উদাসী ভৈরব, রক্তহংস সারং, শিবসরস্বতী এবং বেণুকা।

নিম্নে নজরুল ইসলাম সৃষ্টি রাগগুলির পরিচয় (আরোহ–অবরোহ, বাদী সম্বাদী) দেওয়া হল।

দোলনচাঁপা

বাদী–পঞ্চম

সম্বাদী–সড়জ

আরোহ ঃ সা গা ক্ষা পা, গা মা না ধা, পা না ধা র্সা।
অবরোহ ঃ র্সা না ধা না পা ক্ষা পা, গা মা রা সা।

দেবযানী

বাদী–পঞ্চম

সম্বাদী–ঋষভ

আরোহ ঃ র্সা ণা ধা পা রা সা।
অবরোহ ঃ র্সা ণা ধা পা রা সা।

মীনাক্ষী

বাদী- ঋষভ

সম্বাদী-পঞ্চম

আরোহ ঃ ণ্ ধ্ সা ণ্ রা, গা মা পা ধা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা ণা ধা মা পা, দা পা মা জ্ঞা রা, গা সা।

অরুণ-রঞ্জনী

বাদী-পঞ্চম

সম্বাদী-ষড়জ

আরোহ ঃ সা, জ্ঞা, পা,হ্মা, পা, দা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা, ণা, দা, পা, জ্ঞা, ঋা, সা।

রূপমঞ্জরী

বাদী-পঞ্চম

সম্বাদী-ষড়জ

আরোহ ঃ সা রা মা পা না র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা না ধা পা, গা মা রা গা, সা রা ন্ সা।

নজরুলগীতি (প্রশ্নোত্তরে)

নির্ঝরিণী

বাদী-পঞ্চম

সম্বাদী-ষড়জ

আরোহ ঃ সা পা গা মা পা র্সা

অবরোহ ঃ র্সা না দা পা হ্মা জ্ঞা রা সা।

সন্ধ্যামালতী

বাদী-পঞ্চম

সম্বাদী-ষড়জ

আরোহ ঃ নাসা, জ্ঞারাসা, গামাপা, ণাধামা, পানার্সা।

অবরোহ ঃ র্সা না দা পা হ্মা জ্ঞা রা সা।

অরুণ-ভৈরব

বাদী-মধ্যম

সম্বাদী-ষড়জ

আরোহ ঃ ধ্ ণ্ মা ঋা সা গা মা, দা পা, ণা ধা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা ণা দা ণা পা মা দা পা মা গা মা ঋা সা।

বনকুন্তলা

বাদী-পঞ্চম

সম্বাদী-ঋষভ

আরোহ ঃ প্ ধ্ সা রা, গা পা ধা পা, ধা র্সা

অবরোহ ঃ র্সা, না ধা পা গা রা, গা সা।

শঙ্করী

বাদী-গান্ধার

সম্বাদী-নিষাদ

আরোহ ঃ সা গা পা না ধা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা ণা দা পা, মা জ্ঞা সা।

শিবানী-ভৈরবী

বাদী-ষড়জ

সম্বাদী-পঞ্চম

আরোহ ঃ সা রা জ্ঞা পা, দা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা ণা দা পা, মা জ্ঞা সা।

যোগিণী

বাদী-পঞ্চম

সম্বাদী-ষড়জ

আরোহ ঃ সা ঋা জ্ঞা ক্ষা দা পা, মা পা ণা দা পা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা না দা পা, পা ক্ষা গা, মা, ম গ ঋা সা।

রুদ্র-ভৈরব

বাদী-ধৈবত

সম্বাদী-ঋষভ

আরোহ ঃ সা ঋা মা দা, ণা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা ণা দা মা ঋা সা।

আশা-ভৈরবী

বাদী-পঞ্চম

সম্বাদী-ষড়জ

আরোহ ঃ সা ঋা জ্ঞা সা ঋা মা, পা দা ণা পা দা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা দা পা মা ঋা সা।

উদাসী-ভৈরব

বাদী-মধ্যম

সাম্বাদী-ষড়জ

আরোহ ঃ সা, ঋা, গা, মা, ক্ষ, মা, ক্ষা ণ র্সা, র্ঋা র্সা।

অবরোহ ঃ র্ঋা র্সা ণা ক্ষা মা, মা গা ঋা সা।

রক্তহংস-সারং

বাদী-পঞ্চম

সম্বাদী-ঋষভ

আরোহ ঃ সা রা মা পা ধা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা না পা মা রা সা।

শিব-সরস্বতী

বাদী-মাধ্যম

সম্বাদী-ষড়জ

আরোহ ঃ দ্‌ ন্‌ সা গা মা, দা পা, জ্ঞা মা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা না দা মা দা পা মা জ্ঞা মা সা।

বেণুকা

বাদী-মধ্যম

সম্বাদী-ষড়জ

আরোহ ঃ সা রা মা, পা ণা ধা, পা ধা মা পা ধা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা না পা ধা না, গা রা গা সা।

(৬)
কাজী নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত সাহিত্য জীবনের সিংহভাগ ব্যয়িত হয়েছে সংগীত রচনায়। তিনি পাঁচ হাজারের ও বেশী সংগীত রচনা করেছেন। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে কবিতার থেকে গানের ক্ষেত্রেই নজরুল প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে। গানের সুর বৈচিত্রে তিনি যে আজও অপ্রতিদ্বন্দী, নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে কবির সচেতন উক্তিই তার প্রমাণ।

"সাহিত্যে দান আমার কতটুকু জানা নেই, তবে এটুকু মনে আছে সংগীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। সংগীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, তখন আমার কথা সবাই মনে করবেন – এ বিশ্বাস আমার আছে"।

কাজী নজরুলের নার্গিস প্রেম

রানা জামান

আনুমানিক রাত ৮ টায় চট্রগ্রাম মেলট্রেন কুমিল্লা স্টেশনে প্রবেশ করলো। কাজী নজরুল ইসলাম এবং আলী আকবর খান ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নামলেন। ওদের দেখে বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত এগিয়ে এলেন। আলী আকবর খান এর সাথে হাত মিলিয়ে বললেন,কেমন আছো দোস্ত?
বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত কাজী নজরুল ইসলামকে আড় চোখে একবার দেখে বললেন, ভাল আছি দোস্ত। আলী আকবরের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে কাজী নজরুল ইসলামের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, আপনি? আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না।
কাজী নজরুল ইসলাম বীরেন্দ্র কুমারের সাথে শেকহ্যান্ড করে স্মিত হেসে বললেন, আমি কাজী নজরুল ইসলাম।
আলী আকবর খান বললেন,উনি কবিতা লিখছেন। পত্রিকার সম্পাদকও বটে।
কাজী নজরুল ইসলাম ফের মুচকি হাসলেন। বীরেন্দ্র কুমার বললেন,বাড়িতে ওনার কন্ঠে কবিতা আবৃত্তি শুনবো। এখন বাড়িতে যাই। বেশ রাত হয়েছে।
তিনজন কান্দিরপাড়ে বীরেন্দ্র কুমারদের বাসায় এলেন। সাথে সাথে তাদের খাবার পরিবেশন করা হল। পরদিন আলী আকবর কাজী নজরুল ইসলামকে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখালেন। বিকেলে রওয়ানা দিয়ে রাতে আলী আকবর কাজী নজরুলকে দৌলতপুর নিজ বাড়িতে নিয়ে এলেন। সাথে সাথে বাড়ির সবাইকে বাংলো ঘরে ডেকে এনে কাজী নজরুল ইসলামকে দেখিয়ে বললেন,ইনিই কাজী নজরুল ইসলাম যার কথা পত্রে তোমাদের জানিয়েছি। আমার এই বন্ধুর জীবন খুবই বৈচিত্রময়। এর সম্পর্কে তোমরা আস্তে আস্তে সব জানতে পারবে। এখন খাবার নিয়ে এসো।
কাজী নজরুল ইসলাম মৃদু হেসে বললেন,তুমি আমার সম্পর্কে বেশ বাড়িয়ে বলছো আলী আকবর। আমি একজন অতি সামান্য মানুষ।
তুমি সামান্য কী বিরাট তা পরে বিশ্লেষন করবো মাই ফ্রেন্ড!এখন খাবো।
খাবার আগে হাত মুখটা প্রখ্যালন করতে হবে তো।
অবশ্যই ! চল বন্ধু সামনের পুকুর থেকে হাত মুখ প্রখ্যালন করে আসি। পুকুর থেকে হাত মুখ ধুয়ে দুজন খেতে বসলেন। আলী আকবর খানের চোখের ধমকে বাড়ির সবাই পরিবেশনার দায়িত্বে। পদের আধিক্য দেখে কাজী নজরুলের চোখ কপালে। তিনি সবাইকে একবার দেখে বললেন,একি করেছেন! এতো পদ একটু করে চাখলেও পেট ফুলে ঢোল হয়ে যাবে।
আলী আকবর খান একটা বিরাট আকারের ভাজা কৈ মাছ কাজী নজরুল ইসলামের পাতে দিয়ে বললেন, আপনি আমার বিশেষ মেহমান কাজী সাহেব। শাক সবজি আমাদের ক্ষেতের এবং মাছ পুকুরের। আজ মাংস দেওয়া হয় নি। আগামীকাল থেকে মাংশও থাকবে।
মাংশও কি আপনার বাড়ির?
অবশ্যই! আমাদের বলতে গেলে কোন কিছুই কিনতে হয় না।
সবাই এটা ওটা কাজী নজরুলের পাতে তুলে দিচ্ছে। তিনি বিব্রত হলেও কিছু বলতে পারছেন না; নিরবে হিসাব কষে খাচ্ছেন।
আলী আকবর খান আবার চিবুতে চিবুতে বললেন, আমার এই মেহমানের জীবন খুবই বৈচিত্রময়। তিনি সৈনিক হিসেবে গেলো বিশ্বেযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো তিনি যুদ্ধের ফাকে ফাকে সাহিত্য

চর্চা করেছেন। এখন তিনি নিয়মিত কবিতা গল্প লিখছেন। আসার সময় ট্রেনে বসে একটা কবিতা লিখছেন। চমৎকার কবিতাটা। নীল পরী নাম দিয়েছেন।
আব্দুল জব্বার বললেন,আপত্তি না থাকলে কবিতাটা শুনতে চাই।
কাজী সাহেব খাচ্চেন। কবিতা আবৃত্তি করবেন কিভাবে? কাজী সাহেবের পকেট থেকে কবিতাটি নিয়ে তুমি আবৃত্তি করো।
কাজী নজরুল ইসলাম বুঝতে পারলেন যে এদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। তিনি বুক পকেট থেকে কবিতার কাগজটা বের করে বাড়িয়ে ধরলেন।
আব্দুর জব্বার কাগজটা নিয়ে ভাজ খুলে শব্দ করে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

কবিতার শিরোনাম নীলপরী

ঐ সর্ষে ফুলে লুটালো কার
হলুদ রাঙ্গা উত্তরী
উত্তরী বায় গো-
ঐ আকাশ গাঙে পাল তুলে যায়
নীল যে পরীর দুর তরী।।
তার অবুঝ বীণার সবুজ সুরে
মাঠের নাটে পুলক পুরে
ঐ গহন বনের পথটি ঘুরে
আসছে বনের কচিপাতা দুত ওরি।।
মাঠ-ঘাট তার উদাস চাওয়ার
হুতাশ কাঁদে গগন মন
বেণুর বনে কাঁপবে গো তার
দীঘল শ্বাসের রেশটি যখন
তার বেতস লতায় লুটায় তনু,
দিগ্বলয়ে ভুরুর ধনু।
যে পাকা ধানের হীরক রেণু
নীল নলিনীর নীলম-অণু
মেখেছে মুখ বুক ভরি।

পরদিন সকালে কাজী নজরুল পুকুর ঘাটে বসে মেছওয়াক করছিলেন। আলী আকবর খান এসে মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করলেন, মনে হয় বন্ধুর ভালো ঘুম হয়নি ?
কাজী নজরুল থু থু ফেলে বললেন, তা কেন! ভালো ঘুম হয়েছে।
গভীর রাতে একবার দেখলাম টেবিলে বসে কী লিখছো। কবিতা লিখেছো বুঝি?
আমি এখন ঢেকি। স্বর্গে গেলেও ধান বানবো!
কী কবিতা?
শুনতে চাচ্ছো তো? শোন।
কাজী নজরুল ইসলাম জামার পকেট থেকে কাগজ বের করে পড়তে শুরু করলেন।

হার মানা হার

তোরা কোথা হতে কেমন করে
মণিমালার মত আমার কণ্ঠে জড়ালি।
আমার পথিক জীবন এমন করে
ঘরের মায়ার মুগ্ধ করে বাধঁন পরালি।
আমায় বাধতে যারা এসেছিল গরব করে এযে
তার হার মেনে হায় বিদায় নিলো কেঁদে
তোরা কেমন করে ছোট্ট বুকের একটু ভালবেসে

ঐ কচি বাহুর রেশমি ডোরে ফেললি আমায় বেঁধে।
তোরা চলতে গিয়ে পায়ে জড়াস
না না বলে ঘাড়টি জড়াস
কেন ঘর- ছাড়াকে এমন করে
ঘরের ক্ষুদা স্নেহের সুধা মনে পড়লি।
ওরে চোখে তোদের জল আসে না
চমকে উঠে আকাশ তোদের
চোখের মুখের চপল হাসিতে।
ঐ হাসিই ত মোর ফাঁসি হলো,
ওকে ছিড়তে গেলে বুক লাগে,
কাতর কাঁদা ছাপা যে ও হাসির রাশিতে
আমি চাইলে বিদায় বলিস, উহু
ছাড়বো নাকো মোরা
ঐ একটু মুখের ছোট্ট মানাই এড়িয়ে যেতে নারি।
কত দেশ- বিদেশের কান্না -হাসির
বাঁধন ছেড়ার দাগ যে বুকে পোরা;
তোরা বসলি রে সেই বুক জুড়ে আজ,
চিরজয়ীর রথটি নিলি কাড়ি।
দরদীরা! তোদের দরদ
শীতের বুকে আনলে শরৎ,
তোরা ঈষৎ ছোঁয়ার পাথরকে আজ
কাতর করে অশ্রুভরা ব্যথায় ভরালি।

আলী আকবর খান কাজী নজরুল ইসলাকে নিয়ে গ্রাম ঘুরছেন, এলাকা ঘুরছেন। তার অতিরিক্ত খাতির যত্ন চলছে। কাজী নজরুল ফাকে ফাকে কবিতা লিখছেন। একদিন বিকেলে দুজন পুকুর ঘাটে বসে। কাজী নজরুল পুকুরে মাছের খেলা দেখছিলেন। আলী আকবর খান কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন,আমাদের গ্রাম কেমন লাগছে?
কাজী নজরুল পুকুর থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই বললেন, ভালোই। যাবো কবে?
তোমাকে তো একটা কথা বলা হয় নি।
কী কথা?
বৈশাখের ২২ তারিখে আমার ভাই মুন্সী আব্দুল জব্বারের বিয়ে। কয়েকদিন আগে থেকেই কথাবার্তা চলে আসছিলো।
তিনি বিয়ে করছেন কোথায় ?
মামাতো বোনের সঙ্গে। নাম আম্বিয়া খানম মানিক। ততোদিন তোমাকে থাকতে হবে বন্ধু। যেতে চাইলেও জোর করে আটকে রাখবো।
জোর করতে হবে না, আমি থাকবো। খুব খুশি হলাম বন্ধু। বিয়ের দিন তোমাকে গাইতে হবে।
বৈশাখের ২২ তারিখে মুন্সী আব্দুল জব্বারের বিয়ে। তুমুল হৈ চৈ চলছে। আসর মাতিয়ে বিভিন্ন জন গান করছেন। কাজী নজরুল ইসলামও গান গাইলেন। তার পরপরই একজন অত্যন্ত সুন্দরী গায়িকাকে দেখে কাজী নজরুল মুগ্ধ। তিনি যত না গান শুনছেন তার বেশি মনোযোগে চোরা চোখে গায়িকাকে দেখছিলেন। গান গাওয়া শেষ হতেই মেয়েটি চলে গেলো। নাম জানতে না পারায় তার খুব আফসোস হচ্ছিলো। আলী আকবর খানকে মনে পড়তেই সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলেন। খুজে খুজে ভেতর বাড়ি থেকে আলী আকবরকে আবিস্কার করলেন। তার হাত ধরে টেনে পুকুর ঘাটে নিয়ে এলেন।
আলী আকবর খান অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে তোমার বন্ধু ? আমাকে এভাবে টেনে নিরালায় আনলে কেন ?
কাজী নজরুল ইসলাম সরাসরি বললেন, এই মাত্র একটি মেয়ে গান গেয়ে গেলো মেয়েটি কে ?
আলী আকবর খান ভেতরে ভেতরে হেসে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কেন বন্ধু? মেয়েটি কোন বেয়াদপি করেছে ? নাকি গানটা ভালোভাবে গায় নি?
কী বলছো তুমি আকবর! মেয়েটি চমৎকার গায় সে জন্য ওর বিষয়ে জানতে চাচ্ছি।

আলী আকবর খানের মনে দুষ্টুমি জেগেছে। তিনি ভ্রু নাচিয়ে মিটি মিটি হেসে বললেন,এই মুহূর্তে তো বলতে পারবো না। খোজ খবর নিয়ে তোমাকে পড়ে জানাবো। ওকে ফ্রেন্ড!
কাজী নজরুল ইসলামের চেহারা ম্লান হয়ে গেলো। আলী আকবর খান ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে দুষ্টুমির হাসি মুখে ধরে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। সারাটা দিন কাজী নজরুলের ভালো গেলো না। সারাক্ষণ মেয়েটিকে চোরা চোখে খুজেছেন। বরযাত্রী নববধু নিয়ে ফিরে এলো। খান বাড়িতে তখন অন্য রকম ব্যস্ততা। এই সময়ে কাজী নজরুল মেয়েটিকে কয়েকবার দেখতে পেলেও কাছাকাছি যাবার বা কথা বলার সুযোগ পেলেন না।
সেদিন বিকেল। কাজী নজরুল ইসলাম মলিন মুখে পুকুর ঘাটে বসে। আলী আকবর খান হাসিমুখে ওর দিকে এগিয়ে বলেন। মুখোমুখি বসে বললেন, বন্ধু তুমি এখানে বসে! আমি তোমাকে কোথায় না খুজেছি। মনে হচ্ছে তোমার মন খারাপ ! ব্যাপার কী?
কাজী নজরুল ইসলাম বললেন, সকালে তুমি একটা দায়িত্ব নিয়েছিলে। সেটা এখনো পালন করো নি!
কোনটা? বিয়ের হৈ চৈ এ মনেই নেই!
সেই সকালে যে মেয়েটা গান গেয়েছিলো ওর পরিচয়টা জানাবে।
আরে ও তো আমার ভাগ্নি। নাম দিয়া নার্গিস খানম। চল বন্ধু এখনই তোমাকে ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।
আলী আকবর খান কাজী নজরুল ইসলামের হাত ধরে বাড়ির ভেতর টেনে নিয়ে গেলেন। নার্গিস বাসর ঘরে নতুন বৌয়ের কাছে ছিলেন। আলী আকবর কাজী নজরুলকে বারান্দায় দাড় করিয়ে ভেতরে গেলেন। খানিক পর নার্গিসকে হাত ধরে টেনে বারন্দায় এনে বললেন,এই সেই নার্গিস! ভালো করে দেখে নাও বন্ধু!
কাজী নজরুল ইসলাম তাকালেন এবং নার্গিসের সাথে চোখাচোখ হয়ে গেলো। সাথে সাথে দুজন চোখ নামিয়ে নিলেন এবং সাথে সাথে দুজনের হার্টবিট বেড়ে গেলো। আলী আকবর খান বললেন,এই আমার বন্ধু কাজী নজরুল ইসলাম। সংগ্রামী জীবন। গেলো বিশ্বযুধ্বে মিত্র বাহিনীর সৈনিক ছিলো। এখন লিখছে। সকালে তোর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে। তোরা কথা বল আমি ভেতরটা দেখে আসছি।
আলী আকবর খান ভেতরে চলে গেলেন। কাজী নজরুল নার্গিসের দিকে ফের তাকালেন। নার্গিস মেঝের দিকে তাকিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে মাটি খুড়ছেন। কাজী নজরুল বললেন,চমৎকার আপনার গলা। গানে লয় তাল খুব সুন্দর। আপনি গান গাওয়া বন্ধ করবেন না কখনো। আমি আরেকবার আপনার গান শুনতে চাই। কবে শোনাবেন ? নার্গিস কোন উত্তর না করে ছুটে পালিয়ে গেলেন। কাজী নজরুল ইসলামের হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে এলো।
সন্ধ্যার পর দুই বন্ধু গ্রামের পথে হাটছেন। শুক্ল পক্ষ চলছে। চাঁদের আলোয় প্রকৃতি অপরূপা। কাজী নজরুল বললেন, তোমার আজ বেশ খাটুনি গেলো বন্ধু।
আলী আকবর খান বললেন, বিয়েতে এরকম খাটুনি হয়েই থাকে। আমার আরেকটা বিয়ের আয়োজন করতে ইচ্ছে করছে।
এখন তোমার নিজের বিয়ের আয়োজন করতে পারো।
আমার বিয়ে তো হবেই। তার আগে বলো বেশ কয়েক দিন যাবৎ তুমি আমাদের বাড়িতে আছো। আদর যত্নের কোন ত্রুটি হচ্ছে না তো?
না না তা কেন? মনে হচ্ছে জামাই আদরে আছি।
থ্যাঙ্কু ফ্রেন্ড। আচ্ছা আমাদের বাড়ির সব মেয়েকেই তুমি দেখেছো। কাউকে পছন্দ হয় কি?
হঠাৎ এ প্রশ্ন?
আমি তোমাকে আত্মীয়তার সুতোয় বাধতে চাই বন্ধু।
কিন্তু আমি যে এখন বিয়ের কথা ভাবছি না।
ও। আমার ভাগ্নিকে তোমার কেমন লাগে?
কোন ভাগ্নি?
নার্গিস। সকালে বিয়ের অনুষ্ঠানে যে গান গেয়েছিলো।
চমৎকার গায় তোমার ভাগ্নি।
শুধু গান চমৎকার গায় আর কিছু না?
দেখতেও খুব চমৎকার!
গুড! আলী আকবর মনে মনে বললেন,কেল্লাফতে।
সৈয়দা নার্গিস খানমের ঘুম আসছে না। কাজী নজরুলের ঝাকরা চুলের মুর্তি বেশ বিরক্ত করছে। তিনি এপাশ ওপাশ করছেন। একটা অমোঘ টান অনুভব করছেন। তিনি শুয়ে থাকতে পারলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে বাংলো ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন সারা বাড়ি নিঝুম। বাংলো ঘরের আলো জলছে। তিনি বেড়ার কাছে এসে ফাক গলে ভেতরে তাকালেন। কাজী নজরুল ইসলাম টেবিলে বসে লিখছেন। পলকহীন নেত্রে নার্গিস

কাজী নজরুলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কাজী নজরুল কলম বন্ধ করে উঠে দাড়াতেই নার্গিস ত্রস্তে চলে গেলেন।

পরদিন আলী আকবর খান বড় বোন আসমাতুননেছাকে বললেন,আমাদের বাড়ির একটি মেয়েকেও কাজী নজরুলের পছন্দ হয় নি। নার্গিসকে তার পছন্দ হয়েছে। যে কোন উপায়ে কাজীকে আটকে রাখতে হবে। কাজী নজরুল ইসলাম একদিন পৃথিবী বিখ্যাত দার্শনিক কবি হবে। এর নমুনা আমি পেয়েছি। তাকে হাত ছাড়া করা যাবে না।

আলী আকবর খানের প্রস্তাবে সবাই রাজী। সেই থেকে কাজী নজরুল ও নার্গিসের পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগলো। দুজন পুকুর ঘাটে বসে গল্প করেন গান করেন। কাজী নজরুল স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। অবশেষে আষাঢ় মাসের ৩ তারিখে বিয়ের দিন ধার্য হলো। এই বিয়েতে আলী আকবর খানের পরিবার অত্যন্ত খুশি। খুশির আতিশয্যে আলী আকবর খান অতিদীর্ঘ একটি নিমন্ত্রণ পত্র ছাপালেন।

বিনয় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন –

“জগতের পুরোহিত তুমি তোমার এ জগৎ মাঝারে,
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।”

এ বিশ্ব নিখিলের সকল শুভ কাজে যার প্রষন্ন কল্যানে আঁখি অনিমিখ হয়ে জেগে রয়েছে, সেই পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার করুণা ধারা শ্রাবনের ধারার মতই ব্যাকুল বেগে আজ আমার ঘরে আমাদের মুখের পরে বুকের পরে ঝরে পড়ছে; তাঁর কল্যাণ আতুর আনত আঁখির সুনিবিড় চাওয়া কেমন এক সুধা করুণ আশীষে ছেয়ে ফেলেছে।

শিশির নত ফুলের মতই আজ তাই আমার প্রাণ দেহ মন তার চরণ ধুলোর তলে লুটিয়ে পড়ছে। তাঁর ঐ মহাকাশের মহা সিংহাসনের বনের নীচে আমার মাথানত করে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে ঃ

আমার পরম আদরের কল্যাণীয়া ভাগ্নী নার্গিস খানমের বিয়ে বর্ধমান জেলার ইতিহাস প্রখ্যাত চুরুলিয়া গ্রামের দেশ বিখ্যাত পরম পুরুষ; আভিজাত্য গৌরবে বিপুল গৌরবান্বিত আমাদের মরহুম মৌলবী কাজী ফকির আহমেদ সাহেবের দেশ বিশ্রুত পুত্র মুসলিম কুল গৌরব মুসলিম বঙ্গের ‘রবি কবি’ দৈনিক নবযুগের ভূত পূর্ব সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। বাণীর দুলাল দামাল ছেলে বাংলার এই তরুন সৈনিক কবি ও প্রতিভাবান্বিত লেখকের নতুন করে নাম বা পরিচয় দেবার দরকার নেই। এই আনন্দ ঘন চির শিশুকে যে দেশের সকল লেখক লেখিকা সকল কবি বুক ভরা ভালোবাসা দিয়েছেন সেই বাঁধন হারা দেশমাতার একেবারে বুকের কাছটিতে প্রাণের মাঝে আসন খানি পেতে চলেছে। এর চেয়ে ড়্গাড় পরিচয় আর নাই। আপনারা আমার বন্ধু , আপনজন। আমার এ গৌরবে, আমার এ সম্পদের দিনে আপনারা এসে আনন্দ করে আমার এ কুঠির খানিকে পূর্ণ আনন্দ দিয়ে ভরাট করে তুলুন,তাই এ আমন্ত্রণ।

এমন আচমকা না চাওয়া পথে কুড়িয়ে পাওয়া যে সুখে আমার হৃদয় কানায় কানায় পুড়ে উঠেছে, আপনাকেও যে এসে তার ভাগ নিতে হবে। এদের পাশে দাঁড়িয়ে, মাথায় হাত দিয়ে প্রাণ ভরা আশীর্বাদ করতে হবে। আর একা হলে তো চলবে না। সেই সঙ্গে আপনি আপনার সমস্ত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধককে আমার হয়ে পাকড়াও করে আনবেন এ মহান মধুর দৃশ্য দেখাতে। বিয়ের দিন আগামী ৩রা আষাঢ় ,শুক্রবার নিশীত রাতে। নিশীত রাতের বাদল ধারার মতই আপনাদের সকলের মঙ্গল আশীর্বাদ যেন এদের শিরে পরে এদিন।

আমি আজ তাই জোর করেই বলছি আমার এতবড় চাওয়ার দাবীর অধিকার সম্মান হতে আপনার প্রিয় উপস্থিতি হতে আমায় বঞ্চিত করে আমার চোখে পানি দেখাবেন না। আরজ–

দৌলতপুর, ত্রিপুরা — বিনীত
২৮জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮। — আলী আকবর খান

৩ আষাঢ়। কাজী নজরুল ইসলাম ও সৈয়দা নার্গিস আসার খানমের বিয়ে। দৌলতপুর গ্রাম জুড়ে উৎসব। আলী আকবর খানের বাড়ি নতুন সাজে সজ্জিত। আলী আকবর খানের আশা পূর্ণ হতে চলেছে। তার খুশীর কোন সীমা পরিসীমা নেই। সবাই বরের আগমনের অপেক্ষায়। অবশেষে বর এলেন। আলী আকবর খান বিরজা সুন্দরীকে সাথে নিয়ে বরণ বরন করলেন। রাতে বিয়ের আসর বসলো। আকদ হয়ে গেলো। মেয়ে পক্ষ কাবিন নামায় কাজী নজরুল ইসলামের ঘর জামাই থাকার শর্ত জুরে দিতে চাইলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম আসন থেকে উঠে প্রতিবাদ করলেন, এ হতে পারে না।

আলী আকবর খান হাসিমুখে বললেন,কেন বন্ধু? তুমি আমার বাড়িতে থেকে লেখালেখি চালিয়ে যাবে। তোমার লেখা প্রকাশের দায়িত্ব আমার।

কাজী নজরুল জেদি স্বরে বললেন, তা হয়না বন্ধু। আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘর জামাই হতে পারবো না।

তুমি শুধু শুধু আপত্তি করছো বন্ধু। তোমার তো কোন পিছু টান নেই। এখানে থাকলে তোমার অর্থ রোজগারের চিন্তা করতে হবে না।
তাহলে আপনারা মত পাল্টাবেন না মানে ঘরজামাই না হলে আমার সাথে নার্গিসের বিয়ে সম্পন্ন করবেন না?
তুমি গভীর ভাবে বিষয়টা ভাবো ফ্রেন্ড! সারারাত সামনে পড়ে আছে।
কাজী নজরুল পাগড়ি খুলে বিরজা সুন্দরীকে বললেন“ মা, আমি এখনই চলে যাচ্ছি।”
বিরজা সুন্দরী বললেন,“তুমি বাইরের লোক, পথ ঘাট চেন না, এই রাত্রে একলা যাবে কি করে? যাবেই যদি তবে বীরেন কে সঙ্গে নিয়ে যাও।”
কাজী নজরুল ইসলাম বীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে ১০/১২ মাইল কাদাযুক্ত পথ হেটে চৌঠা আষাঢ় সকালে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে চলে এলেন। মনের দু:খে তিনি একটি কবিতা লিখলেন।

<u>পরশ পূজা</u>

আমি এদেশ হতে বিদায় যেদিন নেবো প্রিয়তম
আর কাঁদবে এ বুক সঙ্গীহারা কপোতিনী সম,
তখন মুকুর পাশে একলা গেহে
আমারি এই সকল দেহে
চুমবো আমি নাই বা প্রিয় নাই বা রলে কাছে।
জানবো আমার এই যে দেহে এই যে দেহে গো
তোমার বাহু বুকের শরম ছোঁওয়ায় কাঁপন লেগে আছে।
তখন নাইবা আমার রইল মনে
কোন খানে মোর দেহের বনে
জড়িয়ে ছিলে লতার মতন আলি হয়নে গো।
আমি চুমোয় চুমোয় ডুবাবো এই সকল দেহ মন,
এদেশ হতে বিদায় যেদিন নেবো প্রিয়তম ॥

মানবতাবাদী নজরুল ও সমসাময়িক বাঙালি

দুলাল চন্দ্র দাস

দ্বিপ কৃতিত্বের বিষাক্ত ছোবলে যখন সমস্ত বঙ্গাদেশ যা বাঙালি জাতি দিধা বিভক্ত হয়ে একে অন্যের উপর ধর্মী কষা সাড়ে রক্তাক্ত করছিল ঠিক তখনই বাঙালি হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় গোড়ামি সম্পূর্ণ উপক্ষো করে মানবতার জয়গান গেয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বহু আগেই তিনি কামনা করেছিলেন। ‘বাংলার জয়হোক, বাঙালির জয় হোক, বাংলা বাঙালির হোক, স্বাধীন বাংলা দেশে ‘শাশ্বত বাঙালি’ হতে পেরেছে মানুষ? বাংলা কি সত্যি বাঙালির হয়েছে? শাশ্বত বাঙালির ধারণাকে বাতিল করে (বর্তমানে বাংলাদেশী) ‘বিশ্ব মানুষ’ হওয়ার পথকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে যেমনি ভাবে, কাজী নজরুলকে দ্বিখন্ডিত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে তেমনিভাবে। অথচ কবি এর বিরুদ্ধেই আপোষহীন ছিলেন। তিনি ছিলেন সোচ্চার। নজরুলের ‘সত্য’ মানুষকে কেন্দ্র করে। চন্ডীদাসের বিখ্যাত উক্তি তার কাছে ও সত্য উপাস্য ছিল- ‘‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’’ তিনিও গেয়েছেন-

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান

নজরুল সত্যের খাঁটি উপাসক। তাই তিনি খাঁটি বাঙালি। তিনি খাঁটি মুসলমান বলেই খাঁটি বিপ্লবধর্মী বাঙালি হতে পেরেছিলেন। তার কাছে মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ পরিলক্ষিত হয়নি। কারণ তার কাছেঃ

নাই দেশ কাল পাত্রের দেশ, অভেদ ধর্মজাতি
সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

তাই কবি সাম্যের গান গাইতে পারলেন। ভগবান তাঁর কাছে মিথ্যা। যদি প্রত্যেক মানুষের মানুষের মাঝে খুঁজে বার করা না যায়। কাজেই হিন্দু মুসলমানদের দ্বন্ধ তাঁর কাছে করেছি স্বার্থের প্ররোচণায় বাঁচিয়ে রাখা এক ষড়যন্ত্র প্রসূত গ্লানি। বিপ্লবী কবির কণ্ঠে তাই শুনি ঃ

'খোদার ঘরে কে কপাট লাগায় কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা!

কবি দুঃখ করে বলেছেন -

মানুষেরে ঘৃণা করি
ওরা কারা কোরান, বেদ বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি!

নজরুলের ফাঁকি নেই। ফাঁকি নেই তাঁর চিন্তায় ও কর্মে। মহাবিশ্বের পুরোহিত নজরুল। বিপুল তাঁর হৃদয়ে পরিসরে বিশ্বের নির্যাতিতদের বেদনার ছায়া পড়েছে। তিনি পাপকে ঘৃণা করতেন পাপীকে নয়। তাই তিনি বিপ্লবী কণ্ঠে সাম্যের গান গাইলেন জগতের সকলের পাপীর উদ্দেশ্যে-

যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই

বিপ্লবী নজরুল বিশ্ব মানবের প্রেমে অভিষিক্ত হৃদয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের নির্যাতিত নর-নারীর বেদনার গান আকুল কণ্ঠে গেয়েছেন। বিদ্রোহী কবির উদ্বেল সঙ্গীত নির্ঝর সারা বঙ্গের বিপ্লবী হৃদয়ের অটুট আত্মবিশ্বাস সঞ্চায়িত করেছিল। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই বিপ্লবীর রক্তে জাগে প্রত্যয় খেলা ঃ-

আমরা সৃজিব নতুন জগৎ,
আমরা গাহিব নতুন গান।

নজরুল ইসলাম জীবনে জাত বিচার মানেননি। সাম্যের দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। জগতের বিচার ক্ষুদ্র তাকে বিদ্রুপ করে তিনি লিখেছেন -

জাতের নামে বজ্জাতিসব জাত জামিয়াৎ খেলছে জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া ॥

হুকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতই জাতির প্রাণ।
তাইতো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান ॥

ইসলামী শিক্ষার বিধান তিনি উদাত্ত সুরে ঘোষণা করেছেন -

আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান
নাহি বড়ো ছোটো সকল মানুষকে সমান
রাজাপ্রজা নয় কারো কেহ
কে আমার তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়
সকল কালের কলঙ্ক তুমি, জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ।

এখানে যে সব ভাগ্যবান সচরাচর নিজেদের বড়ত্ব নিয়ে ছোটদের ঘৃণা করে তাদের বিরুদ্ধে কবির তিক্ত বাণী। উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় যে বড়ত্বের বড়াই নেই। কবি সেই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। মানবপ্রীতি কবিকে কি অপরূপ মুগ্ধ করেছে। উপরের কবিতায় তা প্রকাশ পেয়েছে। হৃদয়ের প্রেম ধর্ম যে প্রেম মানুষের কল্যাণে উৎসারিত হয়ে উঠে। তাই তিনি লিখেছেন -

তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ
এই কন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান
এই খানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান
মিথ্যা শুনিনি ভাই -
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই"।

মানব প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্ম এসে হৃদয় কন্দরে মিলিত হয়েছে - বিশ্ব সেখানে কোলাকুলি করে। এই হচ্ছে কবির বাণী ও ধর্মের রূপ আমাদের দেশের একটি প্রধান দোষ হচ্ছে সামাজিক ও কুল মর্যাদার মিথ্যা অহংকার। কবি এই ভেদাভেদ মিটিয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি যুগবাণীতে লিখেছেন- ''সমাজ বা উম্মো লইয়া এই বিশ্রী উঁচু নিচু ভাবে। তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।" এই বিশ্ব মানবতার যুগে যিনি এমনি করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন তাহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি।

সত্যিইতো নজরুল ছিলেন সর্বযুগের বিশ্বমানবতাবাদী খাঁটি বাঙালি পুরুষ। কিন্তু বাঙালিরা সত্যিকার মানুষ বা খাঁটি বাঙালি হতে পারেনি। ওরা রাষ্ট্রধর্মে একটামাত্র ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে সর্বযুগের বিশ্বমানবতা থেকে নিজেদের দুরে সরে দিয়েছে। আজকের বাংলাদেশে আদিবাসী হতে আরম্ভ করে বিভিন্ন উপজাতি বিভিন্ন

ধর্মীয় বৈচিত্র নিয়ে বসবাস করে আসছে হাজার বছর ধরে। তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ অধিকার না দিয়ে রাষ্ট্রধর্মের মাধ্যমে আদিবাসী বা উপজাতি সহ অন্য ধর্মীয় লোকদের মানবেতর অবস্থায় রাখা। কখনই নজরুলের কাঙ্খিত বিশ্ব মানবের বৈশিষ্ট্য নয় বা শাশ্বত বাঙালির বৈশিষ্ট্য নয়। দেশ-জাতির গন্ডি পেরিয়ে যে মানুষ, সেই মানুষ হতে গেলে আগে যে কায়মনে বাঙালি হতে হবে। শাশ্বত বাঙালি হতে হবে, সেই বিষয়টাতেই তিনি বিশেষ জোরা দিয়েছিলেন।

আমাদের নজরুল

মৃদুল রায় টিটু

যেতে নাহি দেব হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়' -এই চিরন্তন বাক্যটি সত্য যেমন। তেমনি কবি নজরুলও আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলেন কোন এক শুভ ক্ষণে মায়ার সংসারের সকল বাঁধন ছিন্ন করে। এটাই সত্য, এটাই বাস্তব। সবাইকে একদিন এই মায়ার সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে। কবির বেলায় তাই হয়েছে। আজ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১০৬তম জন্ম বার্ষিকী আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি - সাম্যের কবি, তারুণ্যের কবি, বিদ্রোহী কবি, বাঙালির অহংকার, বাংলা মায়ের সূর্য সন্তান, প্রিয়-সবার-প্রিয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম' কে। তাঁর সৃষ্টি চির স্মরণীয়, বরণীয়, অম্লান। আমাদের বাঙালির হৃদয়ের স্পদন, ধমনীর অগ্নিবান কবি নজরুল। যে কবি জীবনের প্রথম প্রহর থেকেই ছিলেন জীবন যুদ্ধে সংগ্রামী, ত্যাগী, এক কথায় প্রতিবাদী। তিনি কখনো ভয়ে পেছনে ফিরে যাননি। শত বাধা উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়েছেন সম্মুখের পানে নিজের প্রতি বিশ্বাস রেখে। তাঁর জীবন চলার পথ ছিল খুবই দুর্গম, দুর্বিসহ্য এবং সংগ্রামী। আমাদের দুঃখ মিয়া কবি নজরুল। যার জীবন শুরু হয়েছিল আসানসোলের মত অজপাড়া গাঁয়ের চা-এর স্টলে কর্মের মাধ্যমে।

বাঙালি আজ স্বাধীন - সার্বভৌম বাংলার অধিবাসী একমাত্র কারণ নজরুলও হতে পারে, এ সত্যকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই। বাঙালি স্বাধীন আজ নজরুলের প্রতিবাদি রচনাবলীর কারণে। তাঁর লেখা-কবিতা, গান এবং প্রতিবাদ মুখর ব্রজ কণ্ঠের শ্লোগান ছিল বাঙালির স্বাধীনতার পূর্ব শর্ত তথা স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি বড় শক্তি। তিনি কারা নির্যাতন সহ্য করেও বাংলা মায়ের জন্য জীবনের শেষ বেলাতেও গেয়ে গিয়েছেন সাম্যের গান। জন্মভূমির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমই ছিল তার মূল কারণ। বাঙালি যুগে যুগে শোষণ-বঞ্চনার শিকার, হয়েছে নির্যাতত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, হয়েছে প্রতারিত। কবি নজরুল এই সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছিলেন সব সময়। তাঁর ত্যাগ বাঙালি জাতি ভুলে গেলে তা হবে নজরুলকে অসম্মান করা। আমাদের নজরুলকে অসম্মান করা। কবি নজরুল স্বাধীনতার কান্ডারী, মহান পুরুষ-দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক বীর সৈনিক। নজরুল ছিলেন যৌবণের কবি। তিনি সব সময়ই তরুণদের জয়গান করতেন। তিনি যৌবণের জয়গান করেই তারুণ্যের জোয়ার সৃষ্টি করেছেন। তাই তার উচ্চারণ-

আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে - বাতাসে ধ্বনিবে না।

নজরুল চলে যাওয়ার পর আমরা বুঝেছি এই সেই দুখু মিয়া আমাদের নজরুল। যার প্রতিটি রচনাবলী ছিল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, সাম্যের গান, মুক্তির পথ। নজরুল আমার অহংকার, বাঙালির হৃদয়ের আসনে অধিষ্ঠিত এক মহান পুরুষ। বঙ্গ জননীর সূর্য সন্তান। যুগে যুগে তুমি থাকবে অমর হয়ে বাঙালির হৃদয়। নজরুলকে দু'কলম লেখার সাহস সঞ্চার করেছি এটাই অনেক পাওয়া। এর বেশি কিছু নয়। শেষ কথা এই যে-

"যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে,
অস্ত পারের সন্ধ্যা তারায় আমার খবর পুছবে, বুঝবে সেদিন বুঝবে।"

বিদ্রোহী কবি নজরুল ঃ

মিজানুর রহমান রানা

বহু মুখী প্রতিভার অধিকারী ''সংগীতের রাজাধিরাজ সুরের রাজ্যে সুমহান সম্রাট'' হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ললাটে বিদ্রোহের যে জয় টিকা পড়েছে তা কোন ক্রমেই মুছবার নয়। যখন পৃথিবী জুড়ে চলছে বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ ইত্যাদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির পরদেশ লুণ্ঠন, অন্যায় শাসন, মানবতা লুণ্ঠন, শোষণ-শাসন ইত্যাদি ইত্যাদি। কবি জন্মেছিলেন ঠিক এমনি এক মুহূর্তে-যা কবির ভাষায় বলতে হয়-

" অবিশ্বাসীরা শোনো, শোনো সবে জন্ম -কাহিনী মোর,
আমার জন্ম-ক্ষণে উঠেছিল ঝঞ্ঝা-তুফান ঘোর।
উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহ-দ্বার,
ইসরাফিলের বজ্র-বিষাণ বেজেছিল অনিবার।"
(চর-নির্ভয়)

উপরোক্ত কবিতার এই কয়েক লাইনের তাৎপর্য বোধহয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা বোঝতে পারি কবি তার জন্ম-কাহিনী-ই শুধু উপরোক্ত কবিতায় বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি বোধ হয় এটাও বোঝাতে চেয়েছেন যে, কবির জন্মকালীন সময়ের প্রেক্ষাপট ছিল ঝড় রূপী দেশী- বিদেশী অশুভ শক্তির অন্যায়-অত্যাচার, বঞ্চনা-লাঞ্চনার করুণ সময়কাল। ''উড়ে গিয়েছিল ঘরের ছাদ ও ভেঙেছিল গৃহ-দ্বার'' বলতে আমরা বোঝতে পারি সে সময়কার কথা, যখন বিদেশী বেনিয়া শক্তি এদেশকে কুক্ষিগত করে কব্জা করে রেখেছিল নিজেদের আয়ত্বে।

কবি নজরুলের জন্ম যেহেতু উপরোক্ত সময়কালীন সময়ে; যখন ভারতীয় উপমহাদেশের ঘরের ছাদ উড়ে গিয়েছিল এবং গৃহ-দ্বার ছিল না। তাই কবির তখন লেখনি, রচনা, চিন্তা-চেতনা কালবৈশাখীর ঝড়, উল্কা-র মতই ক্ষুরধার ছিল। কবির মধ্যে জেগে উঠেছিল বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে চির-বিদ্রোহ। কবি নির্ভিক চিত্তে রচনা করেন-

"আমি আল্লার সৈনিক, মোর কোনো বাধা-ভয় নাই,
তাহার তেজের তলোয়ারে সব বন্ধন কেটে যাই।
তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপ্লবী হাওয়া,
'জেহাদ', 'জেহাদ', 'বিপ্লব', 'বিদ্রোহ,' মোর গান গাওয়া
পুরাতন আর জীর্ণ সংস্কারের আবর্জনা
দগ্ধ করিয়া চলি আমি উন্মাদ চির-উন্মনা।"

কবি ছিলেন সর্বদা উত্তাল খেয়ালের মানুষ। যেখানে নেই কোন ভয়-ভীতি, সংকোচ। তিনি পুরাতন রূপী আবর্জনাকে সর্বদা পরিহার করে চলতেন চির-উন্মনা-র মতো। তিনি কখনও ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধী জীবন যাপন করতে চাননি। তাঁর কথায়-

"থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে
দেখবো এবার জগতটাকে.."

এ কবিতায় কবি, রূপক অর্থে শোষিত, বঞ্চিত, নিগৃহীত, লাঞ্চিত মানুষদের নিজ ঘরে আবদ্ধ না থেকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে জগতে অন্যান্য দেশে যেভাবে মানুষ শোষক, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে তাদের অনুসরণ করার ইংগিত করেছেন। বঞ্চিত মানুষরা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, যুদ্ধ-বিগ্রহের দিকে তাকালেই তারা তাদের শৃংখলিত বন্ধীত্বের, বঞ্চনার কথা ভালভাবে উপলব্দি করতে পারবে। তাই কবি তুরস্কের উদ্ধারকর্তা কামাল আতার্তুক সম্পর্কে রচনা করেন-

"ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুরপুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।"

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির এদেশে লুটতরাজ, নির্যাতন, শোষণ ইত্যাদির জন্য তাদের প্রতি কবির প্রচন্ড ঘৃণা উচ্চারিত হয়েছে। সে সাথে নিজ মাতৃভূমির প্রতি চির উন্নত শির-কবির প্রচন্ড ভালবাসা, কবি সর্বকালের সর্ব দেশের বঞ্চনা, শোষণ ও রাহুর করাল গ্রাস থেকে মুক্তির অগ্রদূতদের প্রতি কবি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন ও তাদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। হোক সে ভিন্নদেশী কিন্তু উদ্দেশ্য যখন এক ও মহৎ তখন যদিও মত ও পথ ভিন্নতর হয়ে থাকে তাহলে কোন সমস্যা নেই। কবি তাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি সর্বদা এই দেশের মাটি ও মানুষের কথা চিন্তা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি। নতুন অরুন্যোদয়। যে-পথেই সেই মুক্তি আসুক না কেন, তিনি তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

''পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত ওরা ডাকাত
তাই ওদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত।"

বিদেশী বেনিয়া শক্তির প্রতি কবির যে প্রচন্ডতম ঘৃনা তা উপরোল্লেখিত কবির বানী থেকেই বোঝা যায়। তাই কবি এই ঘৃণ্য শক্তির বিরুদ্ধে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে এই দেশের মানুষদের জাগ্রত করেছিলেন-

"ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুর বাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও।
জাগো গো জাগো গো,
তন্দ্রা অলস জাগো গো,
জাগো রে। জাগো রে!"

কবিকে বহুবার জেলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি দমে যাননি। কারণ তার অস্থিমজ্জায় লুকিয়ে আছে স্বাধীনচেতা একজন বীরবাহুর অস্তিত্ব। তিনি রচনা করেন-

"দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচেছ ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কশাইখানা, -আসবি কখন সর্বনাশী?"

কবি শুধু যে বিদেশী শক্তির অত্যাচারের, শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধেই লড়েছিলেন তা নয়। তিনি এদেশে তৎকালীন সময়ে বকধার্মিক, ভন্ড ধর্ম-ব্যবসায়ীদের অন্যায় ফতোয়া ও তাদের ভন্ডামীর বিরুদ্ধেও কলম ধরেছিলেন-

"মুখে ভজে আল্লা হরি, পূজে কিন্তু ডান্ডা গুঁতো
দাড়ি নাড়ে, ফতোয়া ঝাড়ে, মসজিদে যায়, নামাজ পড়ে

কবির প্রতিবাদের বিশেষ সম্মোহনী শক্তি, কাব্যের তেজ, ইত্যাদির প্রতি এদেশের মানুষ ক্রমে ক্রমে মোহিত হয়ে কবির পদাংক অনুসরণ শুরু করেছিল। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন যায়গায় বিভিন্ন ভাবে আন্দোলন শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত বিদেশী শাসক চক্র কবির প্রতি তাঁর এই সব আচরণের জন্য চরম ভাবে ক্ষুব্দ হয়। তারা কবিকে জেলে পুরে ডান্ডা বেড়ি পরিয়ে রাখে। কিন্তু হলে কি হবে, চিরবিদ্রোহী নজরুলের বুকে জ্বলতো সর্বদা অগ্নিঝলক। মাতৃভূমির প্রতি কবির প্রচন্ডতম ভালবাসা তাঁর বুকে শাসকচক্রের অত্যাচারের প্রতি আগুনের লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে দেয়। কবি ছিলেন স্বাধীনচেতা। তিনি কখনও অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজের 'শির' নত করেন নি। নজরুল ছিলেন চির উন্নত শির। জেলে পুরে রাখে কার সে সাধ্য? অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনশন করলেন জেলে বসে-

"জাগো অনশন বন্ধী ওঠরে যত-
জগতের লাঞ্চিত ভাগ্যাহত জাগো।"

গান রচনা এবং গাওয়ার মধ্য দিয়ে বন্দিদের জাগ্রত করলেন। ''শিকল পড়া ছল মোদের ঐ শিকল পড়া ছল '' গান গেয়ে অবশেষে মুক্তি পেলেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি থেমে থাকেন নি। যার অন্তরে সর্বদা জ্বলতো অগ্নি চিতার হুমানল সে কি বসে থাকতে পারে? তিনি রচনা করলেন আগুন-ঝরা ভুবন বিখ্যাত সেই গান-

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট।"

তোমার জন্ম দিনে

মাহবুব আনোয়ার বাবলু

জন্ম থেকে জ্বলছি মাগো –একথাটি একশ পার্সেন্ট মিলে যায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের যাপিত জীবনের ক্ষেত্রে। কৈশোরে জঠর জ্বালা, যৌবণে যুগ যন্ত্রণা, প্রেম, ভালোবাসা তথা প্রথম দাম্পত্য জীবনে শরবিদ্ধতার জ্বালা। তবে একটা অনন্য উপমা এবং দহনের যে দুটি দিক আছে তা–না বলে পারছিনা। যাযাবরের দৃষ্টিপাত নামক কালজয়ী উপন্যাসের নায়ক চারুদত্ত আধাঁরকার সম্পর্কে যাযাবরের উচ্চারণ "যে আগুনে আলো নেই অথচ দহন আছে সেই দীপ্তিহীন নির্দয় আগুনের দহনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলো হতভাগ্য কান্ডজ্ঞানহীন চারুদত্ত আধাঁরকার ".উপন্যাসের নায়িকা শর্মিষ্ঠার দেয়া আগুনে আলো ছিলোনা, ছিলো শুধুই দহন।

যে দহনে আধাঁরকার জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেলো। কিন্তু বাস্তবের জীবন্ত নায়ক নজরুলকে তাঁর প্রথম স্ত্রী নার্গিস যেভাবে আঘাত করেছিল। নজরুলের অন্তর আত্মায় বিমূর্ত পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সে আগুনে দহন ছিল বটে তবে সেই সাথে ছিল অরুন্ধুতীর ত্যাজ, আলো। তাঁর প্রমাণ নার্গিসের সাথে বিচ্ছেদের অনেক দিনপর নজরুলের লেখা সেই চিঠি। নজরুলকে নিয়ে যারা পি, এইচম, ডি, করেছেন তাদের পাঠ্য যে চিঠিতে নার্গিসকে নজরুল লিখেছেন। চিঠির অংশ বিশেষ আমি তুলে ধরলাম।

"নার্গিস, সেদিন সেই খরতপ্ত দুপুরে তুমি আমার পাজরে যে আঘাত করেছিলে, হৃদয়ে, অন্তরের অন্তস্থলে যে অগ্নী জ্বালিয়ে দিয়েছিলে তাতে আমি অন্তর দহনে দহীত হয়েছি বটে হয়েছি বিশ্ব কিন্তু নার্গিস সেই সাথে হয়েছি ঋদ্ধ। সত্যি বলতে কি তুমি যদি সেদিন ওভাবে আঘাত না করতে ,না পোড়াতে, তাহলে আমি কোন দিনই বোধহয় ভাঙ্গার গান, বিষের বাঁশী, অগ্নীবীণা সৃষ্টি করতে পারতাম না। আমার কলম দিয়ে অগ্নীত্যাজ বেরুত না। অতএব নার্গিস স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এ সৃষ্টির জন্য পরোক্ষভাবে হলেও তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থেকেই গেলাম। ---------নজরুল "

আধাঁরকার শুধুই পুড়েছেন আর নজরুল ঝলসে উঠেছেন। সত্যি মহান সৃষ্টির নেপথ্যে "কেওস অথবা কেওটিক" জীবন যাপন বোধহয় অনেকটা অনিবার্য। নজরুলের জীবনটাতো খুবই ছোট। বার্ধক্যের অনেক আগেই তিনি মারা গেছেন। আর যে নজরুল থুরথুর বুড়ো অবস্থায় ঢাকায় মারা গেছেন তিনি আসলে সেই নজরুল না, স্রেফ নজরুলের দেহ মাত্র। আসল নজরুলের মৃত্যু ঘটেছে শান্ত করার জন্য ইঞ্জেকশন দেয়ার পরপরই।

গানের নন্দনতত্ত নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে গেলে নতশীর স্বীকার করতেই হবে এ উপমহাদেশে সর্বপ্রথম গানের নন্দনতত্তে নতুন মাত্র যোগ করেছেন কাজীদা। তাছাড়া ইমন কল্যাণ, বাগেশ্রী, ভৈরব , মন্দ্রসপ্তক, দরবারী কানাড়া, মুজরা, এমনকি ষোল মাত্রার দিপক রাগের আলাপ, মেঘমল্লারের আলাপ এমনিক মজুরা নিয়েও কাজ করেছেন তিনি। কী বাণী, কী সুর সোনার হাতে সোনার কাঁকন। সুরের এই বৈচিত্র সমন্বয়, গভীরতা আর বয়ানে যে ঘুরণার সৃষ্টি করে গেছেন তিনি তা এক কথায় আনপ্যারালাল। ওদিকে ইসলামী সঙ্গীতের সাথে সাথে শ্যামা সঙ্গীত এবং তাঁর কবিতাকে, অসাম্প্রদায়িকতা কথাই জানান দেয়। তাঁর গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাসের ডেপ্থ নিয়ে বিদগ্ধ পাঠক কুল আজো সম্মোহিত। তবে আমার মতো নজরুলের গান, কবিতা, উপন্যাস ঠিক যতোটা সমৃদ্ধ তাঁর লেখা নাটক (রাক্ষসী ছাড়া) ততোটা সমৃদ্ধ নয়। অবশ্য আমার মতে নির্বোধ আমজনতার পক্ষে এহেন নীতিবাচক মন্তব্য নেহাৎ ধৃষ্টতা মাত্র তা যাই হোক, সামগ্রীক নীতি ভাবে প্রতিকূল এবং সংকটিময় পরিবেশে নিজেকে সব্যসাচী শিল্পী হিসেবে নজরুল প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন এরচেয়ে বড় গৌরবের বিষয় আর কিইবা হতে পারে আমাদের?

যুগ এবং কালউত্তীর্ণ এই মহাকবির প্রতি আমার সরাসরি উচ্চারণ, নজরুল তোমার অপূর্ণ আশা বুকে নিয়ে আমরা বেঁচে আছি ঠিকই কিন্তু তোমার মতো ঝলসে পারছিনা, তোমার প্রত্যাশা পুরণ করতে পারছিনা। তবে আমি আশাবাদী আমাদের উত্তরকাল নিশ্চয়ই তোমায় স্বরণ রাখবে এবং তোমার মহা সাম্যের প্রত্যাশা পুরণ রাখবে এবং তোমার মহা সাম্যের প্রত্যাশা পুরণ করবে, করবেই। হে মহাকবি, তোমার জন্মদিনে আমার উপহার দু'রাকাত নফল নামাজ তোমার আত্মা শান্তিতে থাক।

হৃদয়ে নজরুল

এস. এম. জয়নাল আবেদীন

নজরুল, তুমি চুরুলিয়ার পথ ধরে এসেছিলে আমাদের বুকে
তখনও তো বুঝিনি আমাদের কাঁদিয়ে
চলে যাবে একদিন তুমি

তোমার চেতনায় ছিল উদ্দীপ্ত বাংলার বুক
তোমার কবিতায় ভেঙ্গেছে শৃঙ্খল, ভেঙ্গেছে লৌহ কপাট।
তোমার লেখায় জাতি পেয়েছে কথা বলা

তোমার ছন্দে শিশু ঘুমিয়েছে জননীর বুকে
তুমি ছিলে বাংলার অহংকার

আজ চরণে চরণে ফুলে ফুলে সৌরভে
জাতি মনে করে তোমাকে।

আজ শ্রদ্ধার ঢালী হাতে নিয়ে জননী কথা বলে তোমার
তুমি কত ফুল কুড়ায়ে কুড়ায়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে

গেঁথে ছিলে বাংলার বুকে।
তুমি আজ আমার অহংকার।

তুমি নবীণে নবীণে সাজিয়ে ছিলে কথা বলার গল্প
তুমি চেতনার অগ্নিবীণা জ্বালিয়ে কথা বলে ছিলে ধুমকেতু

তুমি কত নিশিতে জোৎস্নার আলোয় বসে
ঋতুকে বুকে টেনে কথা বলেছিলে আপন মনে

আজ গ্রীষ্মের ভরা যৌবণে তোমাকে মনে পড়ে বার বার
কেউ বলে তুমি প্রেমিক, তুমি বিদ্রোহী, তুমি জাতীয় কবি

আমি বলি তুমি মানুষের কবি তুমি সাম্যের কবি।
তুমি কথা বল হৃদয়ের তুমি কথা বল জীবনের
কথা বল ভালোবাসার

তুমি আজ বাংলার অহংকার
তুমি আমার কথা বলার রূপকার।

আজ শান্ত মনে মসজিদের কোল ঘেষে
ঘুমিয়েছ আপন মনে

তুমি নজরুল চির শায়িত থাক মাটির গন্ধে

তোমার আত্ম আজ ভরে উঠুক ফুলে ফুলে সৌরভে।

মহান পুরুষ নজরুল
জাবেদ ইমন

বিদ্রোহীদৃপ্ত কবি নজরুল
সাম্যের কবি নজরুল
রূপের দ্যুতিময় সুপুরুষ তুমি
মাথায় ঝাকড়া চুল।

মহান কবি নজরুল
জাতীয় কবি নজরুল
সৃষ্টির উল্লাসে মেতেছিলে তুমি
শোষকের বিরুদ্ধে লড়তে করনাকো ভুল।
প্রেমিক পুরুষ কবি নজরুল
দরদি ও ন্যায় পরায়ন নজরুল
দুর্দিনের যাত্রীদের পথে বিছায়ে দিয়াছ
শিউলি মালার ফুল।

গানের কবি, সুরের পাখি
নির্ভিক লেখক নজরুল
অমর কৃতিত্বে মহিয়ান তুমি
তোমার মতো কবিরত্ন খুঁজে পাওয়া অপ্রতুল

** সম্পাদক-ত্রৈমাসিক মুক্তদেশ, বাংলাবাজার, ঢাকা।*

বিদ্রোহী কবি নজরুল
প্রবীর মজুমদার বাবুল

আগুন থেকে আগুন, ডাকলাম আগুন
আন্দোলিত সচরাচর বাংলাখন্ডে
বিদ্রোহী কার কণ্ঠস্বর ক্রমাগত
অশেষ ধ্বনি প্রতিধ্বনি
হয়ে দিগ্বিদিক
কালের প্রবাহে

ক্ষিপ্র জোড়ালো ঝড় তুলে
বিদ্রোহী কবিতার ভাষার আগুনে
কাছে ডাকে।

আগুন মন মানেনা
কোন পরাভয়

কালের শোষণ বঞ্চনার গ্লানি

পরাধীনতার বিরুদ্ধে দৌড়াচ্ছে
কী ভয়ংকার বিদ্রোহী তায়
অদ্যবধি একজন বিদ্রোহী কবি
নজরুল কাল বোশেখীর মতোন
যাঁর বজ্রকঠিন অগ্নি প্রবাহ

অতল প্রতিভা

এইচ. এম. আজাদ

হে নজরুল-আমি তোমারী সাধনায় ব্রতত
দেখিনি তোমায় বাস্তব, স্বপ্নের ছবি দেখেছি কত,
বাস্তব রূপরেখা আঁকা হৃদয়ে আমার শত শত।
তোমারী সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মে ধাবিত
অসংখ্য জনগোষ্ঠি আজ জাগ্রত,
আমার হৃদয় মাঝে তুমি শ্বাশত।

তুমি অনল লীলার কুসুম কাননের ফুল
তুমি শৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রচন্ড শক্তির মূল,
তুমি পথহারা পথিকের কূল
যেন বিভীষিকার চোখের শূল,
তুমি আমার হৃদয়ের নজরুল।

কণ্ঠে বাজে যখন অগ্নিবীণার সুর
চমকে দাঁড়াই বাজে আকূল করা সমুধুর,
হউকনা সেথা যতদুর।
নয় এই দেশে হয়ত বাজে সেই অচিনপুর
তোমারী কবিতায় বিশৃঙ্খলা সব হয় ভাংচুর,
তুমি আমারী হৃদয়ের আলোকিত নুর।

তুমি কিংবদন্তী, তুমি প্রতিভা
চিরন্তন সকল তোমার কবিতা,
মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তুমি সবিতা,
তোমার চলন বলন আর ব্যক্তিসত্বা
সব কিছুর মাঝে বিরাজমান তীব্রতা,
রয়েছে আমার অপূর্ণতার আবেগ প্রবণতা
তুমি আমার লিখিত এক প্রতিভাবান কবিতা।

চাঁদপুর ১০.০৪.০৫